হঠাৎ সেদিন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
২২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী
ঝর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
. তারক প্রামাণিক রোড,
তা-৬

হিসেব মিলছিল না।

মাঝে মাঝে এ-রকম হয়। হিসেব মেলে না। টাকা-পয়সা লেন-দেন লাভ-লোকসানের হিসেব নয়। সময়ের হিসেব নয়, কারো আচার-আচরণের হিসেব নয়। মাটির তুনিয়ার ওপর এই অস্তিত্বটা সচল সবল রাখার তাগিদে নিজেরই ভিতর থেকে একটা অফুরন্ত যোগানদারী চলেছে। সেখানেই ঘাটতি পড়েছে কোথাও। সে বস্তুটার নাম এনার্জী, কি সংহত আত্মশক্তি, কি আর কিছু জানি নি না। গোড়ায় গোড়ায় ডাক্তারের কাছে ছুটতাম, [illegible] দুই ক্রুআর্থ্রাইটিসের [illegible] ও এঁটিছড়া বেঁধে [illegible] কিছুদিনের জন্য। ডাক্তার টামিন বি-কমপ্লেক্স ঢুকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে. র মনস্তত্ত্ববিশারদ স্বপ্ন জট ছাড়ানোর জন্য চেতনাটাকে পিছন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। তাদেব মতে আমার যা-কিছু গোলযোগ সব পিছনের দিকে, সামনে কিছু না। কিন্তু কত পিছনে সে হদিস তারা আজও পেয়ে উঠল না।

রোগটা কি আমি জানি। হিসেব না-মেলার রোগ। আরো সহজ, হিসেব খোঁজার রোগ। শহরের সারি সারি এই জীবনের মিছিল শুরু আর শেষ অর্থাৎ জীবন আর মৃত্যু নামে তুটো মলাটের মধ্যে বাঁধানো একখানা বইয়ের মত। ওই বই থেকে শীতল ঘোষের তাটা খুলে খসে এসেছে কেমন করে। ওটা হাওয়ায় ভাসছে নো, কখনো বা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে। গ্রন্থিবদ্ধ জীবনের ছিলের সঙ্গে ও-পাতাটার যেন যোগ নেই। তাই শুরু থেকেও চ্ছিন্ন, শেষ থেকেও। ও-পাতাটার নাম জীবনও নয়, মৃত্যুও নয়।

…ওই ছেঁড়া পাতাটা আমি। আমি শীতল ঘোষ। বাবা মা কি আর কেউ, কে আমার নাম রেখেছিল, জানি না। তা দূরদৃষ্টি ঋষির দৃষ্টি। বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝবে না ভিতরে আমার কত জমাট-বাঁধা ঠাণ্ডা। বয়েস চৌত্রিশ, কিন্তু সেটা তিরিশের অনেক এ-ধারে মনে হয় আর সেই রকমই কাঁচা আর তাজা লাগে দেখতে। আয়নায় আমি নিজেই দেখেছি, রোজ দেখি। অত ঠাণ্ডায় কোন জিনিস সহজে নষ্ট হয়? ডীপ্ ফ্রীজে ফল রেখে তিন সপ্তাহ বাদেও পরখ করে দেখেছি, যেমন রঙ তেমনি টসটসে। কেবল হাত ছোঁয়ালে ঠাণ্ডা পাথর। ছুঁয়ে দেখাব মত অত কাছের লোক নেই আমার। বাইরের শীতল ঘোষ চব্বিশে যেমন ছিল, চৌত্রিশে তেমনি আছে, আর চুয়াল্লিশেও তেমনি থাকবে বোধহয়।

কিন্তু ছেঁড়া পাতা [illegible] মিছিলেরই ছেঁড়া পাতা তো। [illegible] হলেও ওটা [illegible] [illegible] বেড়াতে চায়। [illegible] আর [illegible] [illegible] এগোয়। এই করে [illegible] আমি [illegible]
তখন ডাক্তার বলে, ওয়াণ্ডারফুল, ইউ লুক ইয়ংগার। [illegible] নিজের হা[illegible]যশ ভাবে। বলে, ইউ আর পা-ফেক্টলি নরম্যাল নাউ, [illegible] লুক ব্যাক। আমাদের শাস্ত্রে পিছন দেখা মানেই সামনে এগনো।

কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ গণ্ডগোল হয়ে যায় কেমন। তখন হিসেবে গরমিল হতে থাকে। ওই ফারাক ভরাট করার যোগানদারী হিসেবে। মাথাটা তখন ঝিম ঝিম করতে থাকে। সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। নিথর এক শূন্যতার সমুদ্রে যেন অস্তিত্বের কুটো ভাসছে একটা।

…আজও এই রকম হল কেন? হিসেব মিলছে না কেন? ভিতরটা হিসেব হাতড়ে বেড়াচ্ছে কেন? [illegible]কে-বাঁধা দিনের সক[illegible] থেকে এ-পর্যন্ত তেমন কোন ব্যতিক্রমের ধাক্কা খেতে হয়নি। [illegible] সত্যের সঙ্গে অনেকখানি মিথ্যের সুচারু ব্যঞ্জনায় গোটা দুই [illegible] গেঁথে তোলার ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। ফলে বাদ-ব[illegible]

চিন্তা করে আমার চিত্ত বিচলিত হতে পারে।
চোখের সামনে ভেসে উঠল একবার। আমার
মেন ঘোষ। …ওরই গুরুতর কিছু ঘটে থাকতে
শেষও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। …পুলিস এত
রাই খতম করেছে নাকি? মরুকগে, কল্পনায়
টা মৃত মুখ দেখেও আমার ভিতরটা অস্থির হয়ে

মনের অবস্থাটা হঠাৎ এ-রকম কেন? হিসেবের
দিনমানে খোলা রাজপথের ওপর একটু আগে হঠাৎ
র প্রতিক্রিয়া?

কর মত গাড়ি চালাচ্ছিলাম। রেড লাইট দেখে
গ্রীন পেতে আবার স্টার্ট দিয়েছি। স্পীড তখনো
উঠেছে কিনা সন্দেহ, হঠাৎ বাঁ দিকের বাস-স্টপের
-চেঁচামেচি। একটা ডবল-ডেকার দাঁড়িয়ে, তার
লোক নেমে কাকে তাড়া করছে, আর একটা লোক
বিশাল রাস্তাটা পার হতে গিয়েও একটু বেঁকে গেল,
ার ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে পনেরো হাত দূরে ছিটকে মুখ
প্রাণপণে ব্রেক কষেও লোকটাকে বাঁচানো গেল না।
। তফাতে ছুটছিল, অথচ নিয়তির টানে যেন গাড়িটার
।

মিয়ে সবার আগে আমিই টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম
বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়েস, পরনে ট্রাউজার, গায়ে
র্ট। গাড়ির স্পীড কম ছিল, তার উপর ব্রেকও
াঘাত খুব গুরুতর হবার কথা নয়। কিন্তু কমও নয়
ক-মুখ ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। নীচের দিকের দুই
ড় ভেঙে থাকতে পারে।

ধরাধরি-মাত্র তোলা গেল। রক্তাক্ত মুখে লোকটা

আমার দিকে একবার তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, '
বাঁচান বাবু—

—শালা বাঁচাবে তোকে, এবার চিরকালের মত বাঁচানোর ব্য হচ্ছে। কম-বেশি বয়সের জনা পনেরো-ষোল লোক ওর দে ধেয়ে এসেছে। সকলের মুখেই নিষ্ঠুর উত্তেজনা। তাদের একজন ওই কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে ওকে টেনে দাঁড় ক তার পরেই একেবারে মুখের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল আবার। পিছন। আমার উদ্দেশে কে বাহবা দিল, বেশ করেছেন মশাই চাপা দিয়ে পকেট মারতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে পালাচ্ছিল, একেবারে করে দিন—

আমার সঙ্গে যে দুটো লোক আসামীকে টেনে তুলেছিল, ত দ্বিতীয় জন ভূমিশায়ী লোকটার ওপর দমাদম দুটো লাথি ব ও-দিকে হাত নিশপিশ করছে আরো জনাকয়েকের। তাদের চড় বর্ষণে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। সুবিধে হচ্ছে না দেখে আগের লোক দুটোই আবার তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল

ক্ষুদ্র জনতার মুখে আমি হিংসার উল্লাস দেখছিলাম। আর লোক দুটো যেন সাক্ষাৎ যমদূত। মুহূর্তের মধ্যে আমার ম ভিতর কি হয়ে গেল। লোক দুটো একসঙ্গে হাত তুলেছে এ ওই আঘাত নেমে এলে আর মারার দরকার হত কি না বলা না। আমার দু'হাতের আচমকা ধাক্কায় একজন দূরে ছিটকে প আর অন্য জনের মারাত্মক ঘুষিটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

জনতার উল্লাসে ছেদ পড়ল হঠাৎ। ওদের শিকার অ ধরাশায়ী। শতেক জনতার উল্লাসে ছেদ পড়ল হঠাৎ। শ লোকের মাঝেও অপ্রত্যাশিত কিছু করে বসতে পারলে নাট প্রতিক্রিয়া মন্দ হয় না এ আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। এখনও ব্যতিক্রম ঘটল না। জোড়া জোড়া চোখ আমার মুখের ওপর।

যে লোকটা ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়েছিল সে উঠে মূর্তিতে আমার দিকে হু'পা এগিয়ে এল।—খুব দরদ যে মশায়ের, না ?

—শাট্ আপ ! আমার গলার স্বর গম্ভীর, কিন্তু তীক্ষ্ণ। লোকটা কে দাঁড়িয়ে গেল। অপর জনাকয়েকের উদ্দেশে বললাম, আমি নাতেই যাচ্ছিলাম, ধরাধরি করে ওকে আমার গাড়িতে তুলে দিন তা· ·। রক্তে ভেজা নিশ্চল লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজেও কদিকে টেনে ধরে মন্তব্য করলাম, থানায় যেতে যেতেই চোখ উল্টে দেবে কিনা কে জানে—

এবারে অনেকে সশঙ্ক চোখে আসামীর দিকে তাকাল। মুমূর্ষু-শাটাই বটে। রক্তে ভাসছে। কাজ হল. ওরাই ধরাধরি করে লাকটাকে গাড়ির পিছনের সীটে তুলে দিল।

—আপনারা সঙ্গে কে আসবেন আসুন। ওই প্রথম আক্রমণকারীটির দিকেই চোখ গেল আবার।—আপনি এলে ভাল হয়, এদিক-ওদিক হয়ে গেলে আপনাকে একটু দরকার তে পারে।

বার ছুই মাথা নেড়ে আর ঠোঁট নেড়ে লোকটা হন-হন করে চলে গেল। অন্য উৎসাহীরাও পায়ে পায়ে সরতে লাগল। না, কারো চোখ আর সেই নৃশংস উল্লাসের চিহ্নও নেই।

গাড়ি ছুটল। শুরুতেই স্পীড চড়ানো হয়েছিল।···লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে বোধহয়। সামনের মিররে দেখতে চেষ্টা করলাম। সীটের ওপর দলা-পাকানো একটা দেহ, জ্ঞান আছে কি নেই বোঝা গেল না।

গাড়ির গতি আপনা থেকেই যেন বেড়ে গেল আরো। ভিতরটা তেতে আছে টের পাচ্ছি, একটা অসহিষ্ণু তাপ নিঃশব্দে ওঠা-নামা করছে। ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত এই লোকটাকে নিয়ে কি করব এখন তাও ভেবে পাচ্ছি না। এ-ভাবে ওকে গাড়িতে তুলে আনাটা ঠিক

হয়নি বুঝতে পারছি, অনেক রকমের ঝামেলায় পড়তে হতে পা
লোকটার যদি জ্ঞান না হয়, আমার কথা কে বিশ্বাস করবে?
হাসপাতালে চলেছি, সেখানেই নামাতে হবে, কিন্তু তাদের জে
জবাবে আমি যা বলব সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? এক
পকেটমারকে জনতার মারের হাত থেকে এই অবস্থায় ছিনিয়ে এ
নিজের গাড়িতে তুলে চার মাইল ঠেঙিয়ে এত দূরে এসেছি?

···কিন্তু কেনই বা এমন পাগলের কাণ্ড করতে গেলাম? দয়া
মায়া? না, মায়ার ছিটে-ফোঁটাও আমার মধ্যে আছে বলে জানি ন

—বাবু!

পিছন থেকে অস্ফুট করুণ স্বর কানে আসতে চমকে উঠলাম
গাড়ির স্পীড কমিয়ে ঘুরে তাকালাম একবার। দলা-পাকা
লোকটা একটু যেন সোজা হয়ে বসেছে। মাথা তুলতে পারছে ন
ফাটা কপালের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

সামনের দিকে চোখ ঘোরালাম। বলো।

—আমাকে দয়া করে নামিয়ে দিন বাবু, আর কক্ষনো এ কা
করব না।

আর করবে কি করবে না তা দিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার
মুক্তি যেন। এই লোক এরই মধ্যে কথা বলবে আর নামতে চাইবে
ভাবা যায় না। মাঠ ঘেঁষা এই রাস্তাটা নির্জন। হাসপাতাল আ
মাইল খানেকের পথ। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলাম
ওর দিকের দরজা খুলে দিলাম।

···দেখছি। গায়ের জামা তো বটেই, পরনের ট্রাউজারেও চা
চাপ রক্তের দাগ। শুকনো রক্তে মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। মাথা
চুলগুলোও রক্তে চেপসে আছে। সামনের চুলের গোছা চোখের ওপ
এসেছে।

প্রাণপণ চেষ্টায় ভাঙাচোরা দেহটা টেনে-হিঁচড়ে কোনরকমে
মাটিতে নামাল।

তারপর মাটির ওপরেই ধুপ করে বসে পড়ল। গাড়ির ধাক্কা ...র ওপর এই মারের পরেও এখন পর্যন্ত সজ্ঞানে বেঁচে আছে কি ...রে সেটাই বিস্ময়।...মরেই যাবে হয়তো। মরুক!

কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, ছোট গাড়ি আস্তে চলছে দেখে ...রের ভয়ে ইচ্ছে করে তলায় এসে পড়েছিলে?

ঝাপসা দুচোখ একবার আমার দিকে তুলতে চেষ্টা করে বিড় বিড় ...রে বলল, তবু মারতে ছাড়ল না...আর এ কাজ করব না বাবু... ...কেটে হাত ঢোকালাম। একটা পাঁচ টাকার নোট উঠল হাতে। ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। এই অপ্রত্যাশিত আচরণের ফলে লোকটার যেন ভাববিকার ঘটল একটু। দুমড়ানো শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। তার পরেই একটা ডুকরানো আর্তস্বর।—আপনি প্রাণ দিয়েছেন বাবু—তার পরেও দিচ্ছেন—আপনি ভগবান—

—চোপ! মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠল একপ্রস্থ। মুষ্টিবদ্ধ একহাত মাথার ওপর উঠল আর সেই সঙ্গে একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।—দেব এক ঘুঁষিতে মাথার খুলিসুদ্ধ উড়িয়ে।

এবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুহূর্তে মধ্যে চুপসে গেল লোকটা। ...াস করে গাড়ির পিছনের দরজা বন্ধ করে নিজের জায়গায় বসলাম। ...কান মাথা গরম তখনো। গাড়ি ছুটল আবার।...লোকটা ওই পথেই পড়ে মরে থাকবে হয়তো। ওর আমি ক্ষতিই করেছি। সেই ...ারমুখী জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে এলে আর এ কাজ করবে কিনা ভাবতে হত না—এতক্ষণে ও খোদ ভগবানের কাছেই পৌঁছে যেত। ...াসকেল কোথাকারের—

...এরপর, হাসপাতালের এই মাইলটাক পথ পার হওয়ার ...াকটুকুর মধ্যে মনের তলায় সেই পুরনো হিসেব-নিকেশের ধকল।

...হিসেব খোঁজা আর হিসেব মেলানোর চেষ্টা।

...কাজ করি। খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু বাড়তি থাকে সেটা ব্যাঙ্কে

জমা পড়ে। সেই জমার অঙ্কটা ফাঁপিয়ে তোলার ব্যাপারে কিছুদিন আগেও একটা মোহ ছিল। ভেবেছিলাম, ওটা যত মোটা হবে ভিতরের জোরটাও তত শক্তপোক্ত হবে। সেটা যে ভুল নিজেই অনুভব করতে পারি। আমার গভীরে সঞ্চয়ের একটা লুকনো তহবিল আছে। কাজে-কর্মে যখন ব্যস্ত থাকি, মনে হয় ওটাই ভরাট হচ্ছে বেশ। কিন্তু আসলে তা হয় না। হয় না যে সেটা হঠাৎ হঠাৎ টের পাই। তখনই এই গোছের হিসেব-নিকেশ শুরু হয়। আর একটা শূন্যতার বাষ্পীয় ক্ষোভ যেন মাথাব মধ্যে ভরাট হতে থাকে।

কিন্তু কি চাই আমি? কেন এ-রকম হয়। কি পেলে হিসেব মেলে? আজই বা এ-বকম হল কেন? ওই পকেটমাবের মারগুলো আমাবই ওপবে এসে পড়ছে মনে হচ্ছিল কেন? আর একদিন পথের একটা ভিখিবি মা কি কাবণে রেগে তার বাচ্চাটাকে ইটে করে থেঁতলাচ্ছিল। সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল আমার। অথচ মানুষটা আদৌ দয়ালু নই আমি, উল্টে কঠিন বরং। হ্যাঁ, সময় সময় অস্বাভাবিক রকমের কঠিন।

এ-সব সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে সে একেব পর এক ট্র্যাংকুইলাইজার ঠাসবে। আব সিকিআট্রিস্ট শুনলে সে বিজ্ঞের মত মাথা দোলাবে, বলবে, স্প্লিট পাবসোন্যালিটিব ব্যাপাব, আপনার ভিতরে আর একটা অস্তিত্ব আছে, সে সর্বদাই অপবিণত আর সর্বদাই অসহায়। তাই অসহায় কারো ওপর অত্যাচার হতে দেখলেই তার সঙ্গে আপনার ভিতবেব সেই দুর্বল অস্তিত্বের অংশ আইডেনটিফায়েড হয়ে যায়। এ-সব তারই রিঅ্যাকশন।

সামনে হাসপাতালের গেট। গা-ঝাড়া দিয়ে নিজের ওপর দখল নিলাম। চুলোয় যাক ডাক্তার আর তার ট্র্যাংকুইলাইজার, চুলোয় যাক সিকিআট্রিস্ট আর তার স্প্লিট পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টর।

একটা অচেনা গন্ধ নাকে আসছে।

মস্ত হলঘর। দু'দিকের দুই সারিতে দশ-বারোটা-মাত্র বেড। একটা শয্যা থেকে আর একটা শয্যাব বেশ ফারাক। এমারজেনসি ওয়ার্ড বলেই হয়তো বাড়তি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা একটু। এখান থেকে অনেকের মাটিব সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে।

এটা ভিজিটিং আওয়ার নয়। সমস্ত হাসপাতালটা ফাঁকা-ফাঁকা। কিন্তু এ ঘবটায় বেশ কিছু বাইরের লোকের সমাবেশ। প্রায় প্রতিটি বেডের পাশে দু'চারজন করে মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে বা বসে। তাদের কারো চোখে জল, কেউ বা বিষণ্ণ গম্ভীর। রোগীদের কথা জানি না. ওই আত্মীয়-পরিজনেরা এক শেষের প্রহরের ঘণ্টা শুনছে যেন। অনেকের চোখে-মুখে সেটা অস্বীকার করবার আকূতি।

তাদের আশপাশ দিয়ে আর মাঝের প্যাসেজ ধরে ডাক্তার আর নার্সদের তৎপর আনাগোনা। ওদের জুতোর নীচে রাবার সোল, এতটুকু শব্দ নেই কোথাও।

ঘরে পা দিয়ে চারদিকে একবার চোখ ফেরানোর ফাঁকে যে গন্ধটা নাকে এল সেটা ওষুধপত্র ইনজেকশান স্পিরিট অথবা অক্সিজেন প্রয়োগের গন্ধ নয়। এ-গন্ধের অস্তিত্ব আর কেউ টের পাচ্ছে কিনা জানি না।

···মৃত্যুর গন্ধ।

মৃত্যু যেন এখানে নিঃশব্দে যজ্ঞ ফেঁদেছে। মৃত্যুর শীতল হাতের স্পর্শ আমাব দীর্ঘদিনের চেনা। সেটা এই অস্তিত্বের কানায় কানায় ভরাট। কিন্তু তার সমাহিত গন্ধ নাকে আসাটা এই প্রথম।

এখানে এসে দাঁড়ানোর পরেও কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না। সকলেই যে যার রোগী নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার আর নার্স তাদের কাজে ব্যস্ত। সকলের অলক্ষ্যে যেমন এসে দাঁড়িয়েছি তেমনি ফিরেও যেতে পারি। কিন্তু যাবার উপায় নেই। এখানে নিজের ইচ্ছেয় আসিনি। আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। পুলিসের ঠাণ্ডা অনুরোধে এখানে আসতে হয়েছে। সেই অনুরোধ হুকুমের নামান্তর।

চারদিকে তাকালাম আবার। উল্টোদিকের সারিতে ফাঁক-ফাঁক ছ'টি বেড। কোণের একটা শয্যায় রোগীর পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তি যেন একখানা। ছু'জন ডাক্তার আর ছুটি নার্স রোগীর ওপর প্রায় ঝুঁকে কিছু একটা করছে। কাউকে জীবনে ফেরাবার শেষ চেষ্টা বোধহয়। তাদের তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজনের ব্যাজআঁটা পুলিসের সাদা পোশাক। কোমরে রিভলবার গোঁজা। বাকি ছু'তিনটিও পুলিসের লোক সম্ভবত।

···মনে হয় ওইখান থেকেই আমার ডাক এসেছে। অনেকে ঘিরে আছে বলে রোগীর অবয়বও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওই মেয়েটি কে তাহলে? দূর থেকে তাকেই ভালো করে লক্ষ্য করলাম আবার।

···আশ্চর্য!

সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই ভিতর থেকে বিপরীত প্রশ্ন, কি আশ্চর্য? রূপ?

আমি রূপরসিক নই। কলেজে বছর ছুই বায়োলজি পড়েছিলাম। ব্যাঙ্ চিংড়ি আরশুলা ক্লোরোফর্ম করে পিন দিয়ে ওয়াক্স বোর্ডে আটকে নিয়ে চিরে-চিরে ছুরূহ শিরা-উপশিরা খুঁজে বার করতে হত। রূপসীর রূপ আমার সেই গোছের বিশ্লেষণের বস্তু। চামড়ায় মোড়া সুন্দর পেলব দেহ। চামড়া সরালে রক্ত মাংস শিরা উপশিরা। সেগুলো সরালে কঙ্কাল একটা। ··অতিবড় রূপসীরও কঙ্কালের রূপ কেমন?

পাগলামির কথা থাক। ওই মেয়ের রূপ আমার চোখ টানেনি আদৌ। আর রূপসীও কিছু নয়। বয়েসকালের যেরকম মেয়ে দেখলে অনেকের দুচোখ একটু-আধটু প্রসন্ন হয়—সেই রকমই। তাব বেশি কিছু নয়। রূপের থেকেও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিটুকু প্রখব। আপাদমস্তক সাদা পোশাকের দরুন হয়তো সেটা একটু বেশি স্পষ্ট কিন্তু মেয়েদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে কখনো। …বাইরের কোন্ একটা চিড়িয়াখানায় একবার বিশালকায় দুটো ব্রাউন-বেয়ার দেখেছিলাম। দাঁড়ালে খাঁচার ছাদে মাথা ঠেকে এমন প্রকাণ্ড দুটো ভালুক। একটা পুরুষ, একটা মেয়ে। আর তেমনি ওদের মেজাজ। গোঁ-গোঁ করে খাঁচার চাবদিকে ঘুবছে আর ঘুরছে। দুটো ছেলে মেয়ে-ভালুকটাকে উত্ত্যক্ত করতে আচমকা গর্জনে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ে খাঁচা ধরে এমন ঝাঁকুনি দিল যে ত্রাসে সকলেই আট-দশ হাত ছিটকে সরে গেল। একটু বাদে চাকা-লাগানো কাঠের বাক্সয় ওদের খাবার আনা হল। পেল্লায় এক-একখানা মাংসখণ্ড। খাবার দেখেই ভালুক দুটোর মাতামাতি শুরু হল—সবুব সয় না। ভিতরে মাংস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভালুক একসঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে ছুটে এলো। তারপরেই বিচিত্র কাণ্ড। বিরক্ত হয়ে পুরুষ-ভালুকটা তার সঙ্গিনীকে বিপুল হুঙ্কারসহ এমন একটা ধাক্কা মারল যে মেয়ে-ভালুকটা সুড় সুড় কবে সরে গিয়ে খাঁচার অন্যপ্রান্তে বসল—তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তার মবদ-আয়ত্ত মাংসখণ্ডগুলো দেখতে লাগল। যেন কত শান্তশিষ্ট বউটি ওব। গোগ্রাসে খানিকটা মাংস উদরস্থ করার পর পুরুষ-ভালুকটা পায়ে কবে দুটো বড় বড় মাংসের চাঁই সজোরে সঙ্গিনীর দিকে ঠেলে দিতে তবে তার ব্যস্তসমস্ত আহার শুরু।

…আমার ধারণা যত ব্যক্তিত্বসপন্নাই হোক, তেমন পুরুষের দখলে এলে দুনিয়াব সমস্ত মেয়ে শুধু মেয়েই।

আমার ভিতরে একটা বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে মেয়েটির ওই

'নিশ্চল স্তব্ধ মূর্তি দেখে নয়। ···মেয়েটিকে দেখেছি কোথাও। কবে কখন কোথায় দেখেছি'?

তক্ষুনি মনে পড়েছে। মেয়ে হোক পুরুষ হোক, লক্ষ্য করে কাউকে একবার দেখলে আমি ভুলি না বড়। কারো সঙ্গে তু'দণ্ড বাক্যালাপ হলে তো কথাই নেই। এটা খানিকটা স্বভাবের অঙ্গ ; আবার কিছুটা জীবিকার অঙ্গও বটে। ···তু'চার পা এগিয়ে এলাম। হ্যাঁ, সেই মেয়েই বটে। মাস তুই আগের কথা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আটটা হবে। গঙ্গার ধারের সেই রাস্তাটা একেবারে নিঝুম নির্জন। তারই মধ্যে ভিড়ের রাস্তাতেই সন্ধ্যার পরে তখন লোক দেখা যায় না, এই নির্জনে আমার মত ছন্নছাড়া ছাড়া আর কে আসবে। শহর কলকাতায় তখন ট্রাম-বন্ধ বাস-বন্ধ, মারামারি আর লোক-খুনের তুঙ্গোৎসব চলেছে। সব কিছুর আগুন দাম, সস্তা কেবল মানুষের জীবন। যাকে বলে জলেব দাম। যাকে খুশি যেখানে খুশি মারতে চাইলেই মারা যাচ্ছে।

জ্যোৎস্না রাত, রাস্তার একদিকে সারি সারি জোরালো নিয়ন লাইট। সামনের অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বেশ জোরেই ড্রাইভ করে আসছিলাম। হাওয়া খাওয়া ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমার পাশে ছিল মণিদা। মণিলাল সেনশর্মা বেশ ভালমানুষ, নিজের ক্ষতি না করে পরের উপকার করার সুযোগ পেলে সাগ্রহে সেটা করে থাকে। বছর বিয়াল্লিশ বয়েস, স্ত্রী মারা গেছে দশ বছর আগে। কিন্তু নিজেকে আর সংসারের ঝামেলায় জড়ায়নি। একটিমাত্র ছেলে দেরাতুনে থেকে পড়ে। সেখানকার পাঠ শেষ হলে বাইরে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে। এখানে মানুষ হলে ছেলে নাকি প্রথমেই বাপের গলা কেটে দেশের কাজ শুরু করবে। ভদ্রলোক যেমন সুরসিক তেমনি অমায়িক। কিছু বাড়তি রোজগারেব চেষ্টায় সর্বদা সজাগ। সাধারণ চাকরি করে, মাইনে খুব বেশি নয়। তবু এক ছেলে নিয়ে ওতেই নির্ঝঞ্ঝাটে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু

াহে দু'দিন করে রাত্রিতে দুটো টিউশনি বাঁধা। অঙ্ক আর জ্ঞানের ভালো মাথা তার, অতএব ছেলেমেয়ের বাপেরা ধরে াটানি করবে সেটা স্বাভাবিক। তাকে পেলে সপ্তাহে মাত্র দুটি নের জন্য একশো পঁচিশ টাকা দিতে অনেক বাপ-মায়েরই আপত্তি ই। সপ্তাহের বাকি দুটো দিনও আর একটা টিউশনিতে ভরাট র দিতে পারে, চাহিদা তো আছেই। কিন্তু মণিদা ওই দুটো দিন র রবিবারটা ফাঁক রেখেছেন সামাজিক কর্তব্য করার তাগিদে। াজিক কর্তব্য বলতে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, আড্ডা ওয়া। কিন্তু আমি জানি এই যোগাযোগের ফলে টিউশনি থেকে র প্রাপ্তিযোগ বেশি ছাড়া কম হয় না। মণিদা অনেক রকমের জ করে দেয়, অনেক রকমের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়, আর তার লে হাত পেতে অম্লানবদনে টাকাও নিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে র সামাজিক যোগাযোগটা এই কারণেই বেশি।

...তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গঙ্গার ধার দিয়ে ড্রাইভ করে চ্ছিলাম। সামনের দিকে বেশ খানিকটা দূরে একজোড়া নারী-য়ের দিকে চোখ আটকালো। মেয়েটির পরনে রঙিন শাড়ি। নে হাত ধরাধরি করে হাওয়া খেতে খেতে সামনের দিকে ছে।

দিনকাল যা, রাতের নির্জনে এ দৃশ্য ইদানীং বড় দেখা যাচ্ছিল যত শস্তাই হোক, প্রাণের মায়া কার নেই? আমি মন্তব্য াম, পকেটে একটা খেলনা রিভলভার থাকলেও ওদের নিরামিষ য়া খাওয়াটা একটু জমিয়ে তোলা যেত।

মণিদারও ওই দিকেই চোখ। জবাব দিল, তুমি একটি পাষণ্ড। পর বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, একটু স্বাস্থ্যবতী হলে রভাগ মেয়েকেই পিছন বেশ দেখায়, কিন্তু সামনা-সামনি হলেই র।

এই গবেষণায় মাথা দেবার অবকাশ মিলল না। সামনের ওই

জুটির পাশ কাটানোর গজ পাঁচেক আগেই ঈষৎ উত্তেজনায় মণিদা বাধা দিয়ে উঠল, থামো তো একটু, থামো—

হাতে হাত মিলিয়ে হাওয়া খাওয়ার ব্যাপারে স্থূল ছন্দপতন ঘটে গেল একটা। ওই জুটির একেবারে পাশ ঘেঁষে ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা থামতে দু'জনে একসঙ্গে বিষম চমকে উঠল, হাতের বাঁধনও খসে গেল।

মণিদা তাব পাশের দরজা খুলে বাইরের দিকে আধখানা ঝুঁকল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি, মেয়েটি থমকে তাকাল মণিদার দিকে। তারপর ঈষৎ ব্যস্ত মুখে কাছে এল।—মণিদা আপনি....ভালই হল, আমাকে একটু ও-দিকে এগিয়ে দিন তো।

যেন মণিদারই গাড়ি আর সে-ই এগিয়ে দেবার মালিক। কারো কোন অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে পিছনের দরজা খুলে উঠে বসে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমি ধীরে-সুস্থে আরো একটু ঘুরে দেখলাম তাকে। ভিতরটা আবছা অন্ধকার, তবু বোঝা গেল রমণীর দু'চোখ এবার আমার মুখের ওপর সংবদ্ধ। কথা না বাড়িয়ে গাড়িটা চালালেই যেন খুশি হয়। দৃষ্টিটা বাইরেব দিকে ফেরালাম। দয়িতাচ্যুত সঙ্গীটি ঈষৎ বি...চ বিস্ময়ে এদিকেই চেয়ে আছে। ···মুখের ছাদে বাঙালী মনে হল না। ফরসা লালচে মুখ, পরনে দামী ট্রাউজার, গায়ে টেরিলিনের ঝকম..ক শার্ট। বছর পঁয়ত্রিশ হবে বয়েস। অদূরে একটা সাদাটে গাড়িও দাঁড়িয়ে। চালকের আসন শূন্য। আশপাশে আর লোকও নেই যখন গাড়িটা এরই হবে।

লোকটাকে আর বেশি যন্ত্রণার মধ্যে না রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমার ছোট গাড়ি চোখের পলকে তার সমুখ থেকে উধাও। এদিকে মণিদা তিন কোয়ার্টার ঘুরে বসেছে। সামনের দিকে চোখ রাখতে হয়েছে বলে মুখ দেখতে পারছি না। তাব গলার স্বরে আধা-উদ্বেগ আধা-বিস্ময়।—এ-সময় এ-দিকে কোথায় এসেছিলে সুমনা?

—এমনি ঘুরছিলাম।

···সুমনা। আমি শীতল, আর ও সুমনা। 'আমি ঠাণ্ডা একটা জীব, আর একজনের নামের সঙ্গে তাপের ছোঁয়া। উল্টোপাল্টা ব্যাপার। গাড়ি চালাতে চালাতে ওই গোছের কি একটা এলোমেলো চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে আছে।

ওদিকে অস্বস্তি-জড়ানো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি মণিদার। বিড় বিড় করে বলল, এ-সময়ে এদিকে ঘুরছিলে···মা—মানে বেড়াচ্ছিলে?

—হ্যাঁ। গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি এখানে নামব।

বলতে হল না। তক্ষুনি ব্রেক কষে গাড়ি রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিলাম। মণিদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখানে নামবে কেন, রাস্তায় লোকজন নেই বিশেষ···বাড়ি যাবে তো? চল পৌঁছে দিচ্ছি—

বলে বোধহয় মণিদার খেয়াল হল গাড়িটা নিজের নয়। অনুমোদনের আশায় ঘুরে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমার সায় দেওয়া নিরর্থক। দরজা খুলে মেয়েটি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে। অস্ফুট কণ্ঠস্বর কানে এলো, না থাক, আপনারা যান।

তার আচরণ আমাদের বিসদৃশ লাগার কথা এই বোধটুকু মেয়েটির ছিল মনে হয়। সেই কারণে, অর্থাৎ কতটা অবাক হয়েছি বোঝার জন্যই হয়তো আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে সোজা আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বাস-স্টপের দিকে এগলো।

মণিদার আগের রসিকতার জের টেনে জিজ্ঞাসা করলাম, স্টার্ট দেব, নাকি পিছন থেকে আরো খানিক দেখবে?

মণিদার চোখে-মুখে উদ্বেগ আরো প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। ঠাট্টা কানে ঢুকল না। কি করবে তাও যেন ভেবে পাচ্ছিল না। গলার মধ্যেও যেন আটকেছে কিছু, ঠোক্কর খেতে খেতে বলল, কি মুশকিল দেখ তো···এত ভাল মেয়ে, অথচ···

খট্‌ করে পাশের দরজাটা খুলে নেমে পড়ল মণিদাও।—আমিও নামলাম, ইয়ে, তুমি যাও—পরে তোমাকে সব বলব'খন—

হন হন করে সেও ওই বাস-স্টপের দিকে চলল।

…মনের মত কোন নাটক দেখা হলে তার কিছু কিছু দৃশ্যের এক ধরনের রোমন্থন চলে ভিতরে ভিতরে। সেই গোছের একটা স্বাদ নিতে নিতে ঘরের উদ্দেশে গাড়ি ছুটিয়েছিলাম। নির্ভুল অনুমান, মেয়েটি, মানে সুমনা গঙ্গার ধারের সঙ্গীর কবল থেকে ছাড়া পাবার উদ্দেশ্যেই এক অজানা অচেনা লোকের গাড়িতে উঠে বসেছিল। ট্রাম অথবা বাসের রাস্তা পেয়েই নেমে গেছে। ভিতরে ভিতরে পালাবার যার অতখানি তাগিদ, সে অমন হাত-ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিল কি করে? রাতের রাস্তা-ঘাট ফাঁকা জেনেও সে ওখানে এসেছিল কি করতে?

জটিল বিষয় পেলে মাথার কসরৎ চালিয়ে যেতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু এই বিশ্লেষণের ফাঁক ধরে আমারই ভিতরের এক অদৃশ্য নৃশংস পশু যেন থাবা গুটিয়ে বসে জিভ চাটছে। …আমরা ও-সময়ে গিয়ে না পড়লে কি হত? …ওখানে ফাঁকা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল একটা, তা ছাড়াও খুঁজলে আড়াল মিলত। …আমার ভিতরের পশুটা অন্তর্তুষ্টিতে গলা দিয়ে একটা চাপা গর-গর আওয়াজ বার করছে যেন।

…আশ্চর্য, গঙ্গার ধারের ওই অজানা অচেনা লোকটার জন্যই আমার দুঃখ হচ্ছিল।

রাবিশ! নিজের কুৎসিত মূর্তি দেখতে কে চায়? গোটা নাটকটাকেই ঠেলেঠুলে মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম।

মণিলাল্‌ সেনশর্মার সঙ্গে মাঝে আরও দেখা হয়েছে। কিন্তু সুমনা প্রসঙ্গ আর ওঠেনি। সে-ও বলেনি, আমিও তুলিনি। ভুলে গিয়ে থাকতে পারে। উপকারী মানুষ বলে মণিদার সুনাম আছে পরিচিত মহলে। নিজের অপকার না হলে সেধেই অনেকের উপকার করে

ক। সেই কারণে তার স্নেহের পাত্র-পাত্রী কিছু আছে। ওই য়ে সেই গোছেরই কেউ হতে পারে। মণিদার সঙ্গে কোন মেয়ের র্পর্ক নিতান্তই নিরামিষ গোছের মনে হয়। তাকে নিয়ে আমার নব তলায় কখনো কোন মেয়ে-সংশ্লিষ্ট কৌতূহল রেখাপাত করেনি।

এ সেই মেয়ে। গঙ্গার ধারের সেই ক্ষুদ্র নাটকের নায়িকা। মনা···সুমনা কি? ঘোষ বোস মিত্তির মুখার্জী ব্যানার্জী গাঙ্গুলী মরুকগে, যা খুশি হোক, আমার কি?

দূর থেকেই আর এক দফা খুব ভাল করে দেখে নিলাম তাকে। সেদিনের দেখার সঙ্গে আজকের দেখার কিছু তফাত আছে। দিন আত্মরক্ষায় আত্মস্থ ছিল। পুরুষের চোখেও তাই পাল্টা দারণের একটা নেশা ছিল। আজ সেই মেয়ে অপর ··· জীবন-ক্ষার তাগিদে স্থির নিশ্চল। পুরুষের শ্যেনচক্ষুও আজ তাই ওই দা পোশাকের এধারে কিছুটা অন্তত ব্যাহত। ব্যক্তিত্ব নয়, ওই দা বেশ-বাসের মধ্যে এক ধরনের নিষেধের প্রভাব আছে।

ও-দিকেই পা বাড়িয়েছিলাম। আবার থামতে হল। ওখান থেকে এক দুই তিন চার···চারটে বেড ছাড়িয়ে আর একটা বেডের পর চোখ আটকাল হঠাৎ। ওই বেডটার পাশে একজনমাত্র লোক াড়িয়ে। এও পুলিসের লোকই—পরনে সাদা প্যান্ট সাদা কোট, াধে ব্যাজ আঁটা। আগে দেখিনি কারণ আগে ওই লোক ওখানে ছল না। তার সামনের রোগীর নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো।

কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, এক পলক তাকিয়েই বোঝা াল রমণীর দিকে নয়, এ-দিকের এই বেডটার সামনে গিয়ে আমাকে াড়াতে হবে। তীক্ষ্ণ-চোখে শয্যালগ্ন রোগীর মুখ দেখে নিতে চেষ্টা রলাম। এত দূর থেকে দেখাও গেল না, বোঝাও গেল না। গলা র্যন্ত কম্বলে ঢাকা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, নাকে নল। কিন্তু দেখামাত্র

মন বলে দিল ওই ছেলে কে। রমেন। রমেন ঘোষ। আমা খুড়তুতো ভাই। ওরই জন্য আমার এখানে ডাক পড়েছে, নইলে ও মেয়েটি অথবা তার রোগীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? কিন্তু আশ্চ ওই বেডের সামনেও পুলিস, এই বেডের সামনেও। একদিকে চারজ একদিকে একজন। চারজন থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কার ওই বেডের সামনে বয়েসকালের সুশ্রী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। এম কি, এদিকের বিচ্ছিন্ন পুলিস অফিসারটির দৃষ্টিও তার সতীর্থ-পরিবৃ বেডটার দিকেই। ···কিন্তু দুটো বেডের সামনেই পুলিস কেন ?

এর একটাই জবাব, ওই দুটো শয্যায় যে দুটি প্রাণী শয়ান, তাদে মধ্যে কিছু একটা যোগাযোগ আছে।

···রমেন ইদানীং আমার ওখানে ডেরা নিয়েছিল। কম কে বারো বছরের ছোট আমার থেকে, বছর বাইশ-মাত্র বয়েস ছেলেটার হুট করে এক সকালে আমার দোতলার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। অনুরো বা আবেদন-নিবেদন কিছু নয়, স্পষ্ট ঘোষণা, কিছুদিন ওকে এখা থাকতে দিতে হবে।

বিরক্ত হয়েছিলাম। আমাব ঠাণ্ডা চাউনির ফাঁকে সে [illegible] তেমন গোপনও ছিল না। আমার আত্মীয়-পবিজনের সংখ্যা সীমত যাও আছে, তাদের কাছ থেকেও এই সত্তা বিচ্ছিন্ন, অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন এর মধ্যে কারো অনাহূত আবির্ভাব উপদ্রবের মত মনে হয়। অবশ্য এ-ছেলের এ-ভাবে আমার কাছে এসে হাজির হবার পিছনে প্রচ্ছন্ন একটু দাবি আছে। ···একটা মৃত্যুর ঠাণ্ডা স্পর্শ যখন এই দেহে ওপর দখল নিতে বসেছিল তখন কাকা অর্থাৎ রমেনের বাবা সেই হিম দেহটাকে জীবনের তাপের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। ··কিন্তু শীতল ঘোষের মনের তলায় সে-জন্য কৃতজ্ঞতার ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। আজও নেই। বরং একটা বিদ্বেষ জমাট বেঁধে আছে কারণ মৃত্যুকে আজ আমি ভয় করি। মৃত্যুর টুঁটি চেপে ধরার ভয়া অনুভূতিটা আজও আমার চেতনায় ছড়িয়ে আছে। মনে পড়লে দ

হবার উপক্রম হয়। সেই থেকে মৃত্যুর ছায়া দেখলে আমি
তকে উঠি, তু'হাতে সেটা ঠেলে সরাতে চাই।

···কিন্তু সেদিন ভয়-ডর কিছু ছিল না। জীবনটাকে হঠাৎ ধাক্কা
রে মৃত্যুর খাদে ঠেলে ফেলে দিতে পারাটা একটা চরম রসিকতা
াছের মনে হয়েছিল। অসময়ে নিজের সেই তুর্ভর অস্তিত্বের ছেদ
নে দিতে চেয়েছিলাম। অপটু চেষ্টার দরুন সেটা সম্পূর্ণ হতে
রেনি। যাও পারত তারও অবকাশ মেলেনি। টাকা-পয়সা খরচ
ব কাকা সাড়ম্বরে সেই নিশ্ছিদ্র ঠাণ্ডা ঘুমের সম্ভাবনাটি বরবাদ
র দিয়েছিল। আজ প্রায় এগারো বছর আগের ঘটনা
টা। আমার বয়েস তখন তেইশ। ওই রমেন তখন একেবারে
বালক।

···না, ছেলেটা আমার কাছে কোনরকম কৃতজ্ঞতার দাবি নিয়ে
সেনি। সোজা নিজের জোরেই এসে হাজির হয়েছিল যেন। তাব
সার প্রয়োজন তাই এসেছিল। বাবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও
কার দরকার হয়ে পড়েছিল, তাই এসেছিল। এর মধ্যে কারো
চ্ছে-অনিচ্ছে সুবিধা-অসুবিধার ধার ধারে না। তার চাউনিতে বা
নে-বলনে সেই উদ্ধত ঘোষণা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলাম। আত্মীয়
ড়ে যে-কোন মুখ-চেনা বা একেবারে অজানা লোকের বাড়িতেও
তো এ-ভাবে হানা দিতে পারত। আর হাবভাব আচরণে স্পষ্ট
য়ে দিতে পারত, আপত্তি করলে সেটা নিতান্তই অপরিণামদর্শী
জ হবে।

আপত্তি করিনি। বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ এখানে এসে থাকার দরকার
কেন তাও জিজ্ঞাসা করিনি। ওটুকু কৌতূহলও এ-ছেলে পছন্দ
ত না। তাছাড়া সত্যিকারের কৌতূহল ছিলও না কিছু। কোন-
ম হামলা পছন্দ করি না, ঝামেলা বরদাস্ত করতে চাই না—আমার
ক্তি শুধু সেই কারণে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে বিরক্তি আরো
বে।

শুধু বলেছিলাম, থাকবি কোথায়, ছুটো তো মাত্র ঘর, এক
আমি থাকি, আর একটায় শ্রীপতি—

—শ্রীপতির সঙ্গে থাকতে আমার কোন অসুবিধে হবে না, ববং ছুই একদিনের মধ্যে তোমার ঢাকা প্যাসেজটাতে সটক দেখো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি গাঁজা-টাজা খাস?

ও অবাক একটু। —না···কেন বল তো?

—শ্রীপতি আধঘণ্টা অন্তর বিড়ি ফোঁকে, বড় ধকল পোহাতে হলে ওকে ওই ঘর থেকে নড়ানো যাবে না।

রসিকতা ভেবে রমেন হেসেছিল। আভাসে ইঙ্গিতে শ্রীপ আমি তার ঘর আঁকড়ে থাকতেই বলেছিলাম। আর রোজ কেনা-কাটার খুচরো ফেরতের জন্য হাত না পেতে প্রকারান্তে বিড়ির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। শ্রীপতির বোকা-বোকা কিন্তু বোকা নয় আদৌ। আমার মনের কথা ও বুঝে নিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা না করেও রমেনের এভাবে এখানে এসে থাকার কা আঁচ করতে অসুবিধে হয়নি। ···তাড়া খেয়ে এসেছে পুলিসের তাড়া, নয়তো বিরুদ্ধ কোন দলের। কলেজে প পড়তেই ও-ছেলে দলে ভিড়েছে। কোন্ দল বা কি-রকমের জানা নেই। জানার আগ্রহ নেই। তবু ছেলেটার মতিগতি ভাল নয় এ-খবর কানে আসত। কাকা মাঝে-সাজে আমাকে পাঠাত। পাঁচ-সাত বার তলব এলে এক-আধবার যেতে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, তখন ও-বাড়ির সমাচার শুনতে তিন মেয়ের পর কাকার ওই এক ছেলে। আদরের ছেলে। আ আদরের খেসারত দিতে হতে পারে সেটা কাকা বা কাকীমার হি মধ্যে ছিল না। বিপাক সম্পর্কে সচেতন যখন, ছেলে তখ আওতার বাইরে। কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে উঁচু স্তরের কাজে-কর্মে মন দিয়েছে। ছেলেটা চালাক-চতুর ছিল

বক্সাশূন্য না হলে সঠিক রাস্তায় সচল থাকতে পারত। সঠিক রাস্তা বলতে যেটা সব বাবা-মায়েরই বাঞ্ছিত।

আমার চোখের দৃষ্টি প্রখর। ব্যাণ্ডেজ-মোড়া মুখখানা এত দূর থেকে তবু ঠিক-ঠিক সনাক্ত করা গেল না। কিন্তু রমেন ছাড়া আর কে হতে পারে? নইলে আমার ওপর পুলিসের এই হুকুমজারী কেন? আমার নাম-ঠিকানা পেল কি করে? রমেন বলেছে? সেটা সম্ভব নয়, কথা বলার শক্তি থাকলে যত দামাল ছেলেই হোক, এই অবস্থায় সর্ব-প্রথম নিজের বাবা-মায়ের নামই করে থাকে।. ওর পকেটের কাগজপত্র থেকে পুলিস আমার ফ্ল্যাটের হদিস পেয়ে থাকবে। সেটাই সম্ভব।

সেদিকে চেয়ে এক অচেতন দেহের ওপর মৃত্যুর একটা অদৃশ্য থাবা যেন স্পষ্ট দেখছি আমি। অবাক কাণ্ড, তবু ভিতরে বাইরে এতটুকু বিকার নেই। উল্টে নিভৃতের কোথায় যেন মুক্তির বাতাস লাগছে একটু। · শীতল ঘোষ, তোমার মত পাষণ্ডের জুড়ি নেই। কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে জনতার রোষ থেকে একটা পকেটমারকে বাঁচাবার তাগিদে এই আমিই ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম।

· নিজের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কতটুকু?

নিঃশব্দে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হলাম।

···ওদিকে, ওই মেয়েটি যে বেডের সামনে দাঁড়িয়ে, সেখানে কিছু একটা ঘটে গেল বোধহয়। বোধহয় কেন, ওই বেডের রোগী শেষনিশ্বাস ফেলেছে। ডাক্তার দুজন সরে দাঁড়িয়েছে। নার্স সযত্নে শয্যালগ্ন দেহেব গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিয়ে খানিকটা তফাতে সরে গেল। মেয়েটি শয্যাব পাশে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে। অপলক চোখে ও-দিকেই চেয়ে আছে। কাঁদছে না, ভেঙ্গে পড়ছে না। স্তব্ধ শোকের বিশেষ একটা রূপ আছে। ···মেয়েটিকে এই প্রথম আমার ভালো লাগছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। ···কি যেন নাম বলেছিল মণিদা? ··সুমনা। নামের সঙ্গে ও স্তব্ধতার একটা রুচিগত মিল আছে। ও যেন কঠিন সংযমে নিজেকে বেঁধে রেখেছে। মনে হচ্ছিল, ঠিক এই মুহূর্তে ওর পাশে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার ছিল। কাঁধে একখানা হাত রাখবে

···আমি সেই পুরুষমানুষ নাকি! পাগল আর কাকে ব

পুলিসের সব ক'টা লোকের চোখ এখন আমার দিকে বেডের পাশে একজন-মাত্র অফিসার দাঁড়িয়ে, তারও। পা সেদিকেই এগিয়ে গেলাম।

রমেনই বটে। সমস্ত মাথাটা ব্যাণ্ডেজে মোড়া। নীচের দেখতে পাচ্ছি না, পুরু চাদরে ঢাকা। নাকে অক্সিজেনের নল। মুখ। 'মুমূর্ষু' দশা এরও। অমন দাপটের ছেলের এ-রকম মূর্তি কল্পনা করা যায় না। কি মনে হতে ভয়ানক অস্বস্তি

রকম বয়সেই মৃত্যুর একটা জোরালো থাবার যা আমার ওপরেও পড়েছিল। তার জন্য আমি নিজে ছাড়া দায়ী অবশ্য আর কেউ নয়। কিন্তু আমার দশাও কি এই রকমই হয়েছিল? এত অসহায় আর এত করুণ?

গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ও-দিকের বেডের পুলিসের লোক ক'টাও নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকেই নিরীক্ষণ করছে।

তাদের মধ্যে বয়স্ক পদস্থ লোকটি চোখের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকল। তারপর বেড থেকে হাত কয়েক দূরে সরে দাঁড়াল।

সেদিকে এগোতে গিয়ে আপনা থেকেই থমকালাম একটু। ও-দিকের বেডের ওই মেয়েটি এদিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই কল্পনার রাজ্য থেকে যেন কঠিন বাস্তব ভূমিতে আছাড় খেলাম একটা। এই ব্যবধান থেকে ওই মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন।··· স্তব্ধতার তলায় অপরিসীম ক্রোধ আর বিদ্বেষ আর ঘৃণা যেন জমাট বেঁধে আছে।

পুলিস অফিসারটি এবার ভ্রূকুটি করে তাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

এগিয়ে গেলাম। একই সঙ্গে অদূরের রমণী এ-দিকে পা বাড়াল।

ন পদক্ষেপ।

শীতল ঘোষ?

স অফিসারের প্রশ্নের জবাবে তার মুখের ওপর চোখ রেখে ড়ালাম। শীতল ঘোষ।

ুল তুলে রমেনের বেডটা দেখাল।—ওকে চেনেন?

-চিনি। ওর নাম রমেন। রমেন ঘোষ। আমার খুড়তুতো

—ওর বাবার নাম বলরাম ঘোষ?

—হ্যাঁ।

…মেয়েটি পুলিস অফিসারের ও-পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অপলক দৃষ্টি রমেনের ব্যাণ্ডেজে মোড়া মুখের ওপর। দু'চোখ দিয়ে ওর আহত মুখখানা যেন নিঃশব্দে ফালা ফালা করছে। এ-বয়সের কোন মেয়ের এ-রকম চাউনি আর দেখিনি।

—ওর বাবা কোথায় থাকে ?

পুলিস অফিসারের মৃদুগম্ভীর জেরার জবাবে কাকার ঠিকানা দিলাম। নোটবই থেকে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিয়ে অফিসার গম্ভীর শ্লেষের সুরে আবার প্রশ্ন করল, বাপের কাছে না থেকে এই ছেলে আপনার ওখানে থাকে কেন, ওর কাজকর্মের সুবিধে হয় বলে ?

—ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার ওখানে থাকে না, এই দিনকতক হল এসে আছে।

হাসপাতালে গলা চড়ানো গেল না বলেই হয়তো অফিসারের গোল গোল দুই রুষ্ট চোখ আমার মুখের ওপর অকরুণভাবে চড়াও হল।—কেন আছে আপনি জানেন না ?

—না। ভরসা করে জানতে চাইনি।

মেয়েটি আস্তে আস্তে এবারে আমার দিকে ঘুরছে। নিষ্পলক চোখ দুটো আমার মুখের উপর বিঁধে দিচ্ছে। একখানা পাথরের মূর্তির দুই চোখ থেকে যেন রাগ আর ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ছে। ওর বিচারে আমি বুঝি আসামীর প্রধান দোসর।

পুলিস অফিসারের গোল চক্ষু আরো বিরূপ।—তার মানে এই ছেলের অ্যাকটিভিটি আপনার জানা ছিল ?

—জানা ছিল না, কিছুটা শোনা ছিল ?

—আর তার পরেও আপনি চুপচাপ এ-রকম একটা ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন ?

বিরক্তির একশেষ। ভয়ানক অস্বস্তিও বোধ করছি। কিন্তু ঘাবড়েছি ভাবলে আরো পেয়ে বসবে। জবাব দিলাম, দেখুন মশাই এসব ছেলেকে আমাদের থেকে আপনারা ভাল চেনেন, এরা যা চায়

তাতে বাধা দিলে ফল কি দাঁড়ায় তাও জানেন। বাধা দিলে আপনারা রক্ষা করবেন তেমন ভরসাও লোকের বিশেষ নেই আপাতত। যাক. আপনি জেনে রাখুন, আত্মীয় হোক আর যা-ই হোক, এদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি আশ্রয় দিইনি, ও জোর করে আমার একখানা ঘর দিন-কতকের জন্য দখল করেছিল---

পুলিস অফিসারের গোল গোল দুই চোখে একটা হিংস্র অভিলাষ উঁকি-ঝুঁকি দিতে দেখলাম যেন। যাবার জন্য আমি সামনের দিকে পা বাড়িয়েছি। তীক্ষ্ণ চাপা হুকুমের সুরে পুলিস ভদ্রলোক বাধা দিল।– ওয়েট। কোথায় চলেছেন?

ঘুরে দাঁড়িয়েছি। তারপর পাশের দিকে তাকিয়ে থমকেছি একটু। এই মহূর্তে হাসপাতালের এই ঘরের মধ্যেই আমাকে যদি কেউ নৃশংস আঘাত করে বসত একটা, সকলের থেকে খুশি কে হত?

ঐ মেয়েটি বোধহয়।

আঘাত না করলেও অফিসার ভদ্রলোকের ওই গোছেরই রুদ্রমূর্তি। জবাব দিলাম, টেলিফোনে প্রথমে ওই ছেলের বাবা-মা-কে খবর দেব তারপর নিজের ঘরে ফিরব।

রাগত মুখে ভদ্রলোক গর গর করে উঠল, ওয়েট ডাউনস্টেয়ার্স টিল্ উই গেট্ ডাউন্—

গম্ভীর মুখে ফিরলাম আবার। নীচে নেমে এলাম। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দু'জন সাধারণ লোক এ-দিক ও-দিক ঘুর করছে। গাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে সরে একটা সিগা ধরিয়েছি, ওই লোকদুটোর একজন এগিয়ে এল। খ সুরে জিজ্ঞাসা করল, সার, আপনি কি ডাক্তার? ..র আমার

—না। পলকের জন্য

অভদ্রগোছের রূঢ় জবাব পেয়ে লোকটা।বেনি বোধহয়:. খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। ।কি কারণ ওটার

আমার ওপর দিয়েই যেন ছোটখাট ধকল গেল একটা। সেটা এখনো শেষ হয়নি। পুলিস অফিসারটি বদ-মেজাজী লোক বোঝা গেছে। হাসপাতালের ঘরে বলেই সংযত ছিল, নীচে নেমে এলে তার ব্যবহার আরো রূঢ় হবে হয়তো। কিন্তু আশ্চর্য, আমার ব্যবহারও ও-রকম অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল কেন? আমার ভিতরে বাইরে হুটো মানুষ। বাইরের মানুষটা সদা হাসি-খুশি, সর্বদা চটপটে স্নভাষী অমায়িক। ভিতরের মানুষটাকে শুধু আমি চিনি, একটু-আধটু শ্রীপতি চেনে, আর কাকা-কাকীমার বাড়ির ওরা কিছুটা আঁচ পায়। পুলিস ভদ্রলোকটির সামনে আমার আরো অমায়িক আর মিষ্টভাষী হবার কথা। কিন্তু হয়ে গেল তার উল্টো।

ওই মেয়েটির জন্য? তার হুটো চোখ দিয়ে রাগ আর ঘৃণা আমার মুখের ওপর গল গল করে ঠিকরে পড়ছিল বলে?··· অস্বাভাবিক কিছু নয়, যে ছেলেটা মারা গেল সে ওই মেয়ের খুব নিকট কেউ হবে। যতটুকু বোঝা গেল, তার মৃত্যুর জন্য রমেনই দায়ী। তাই যদি হয়, রমেনের কাছাকাছি যারা আছে তাদের সকলকেই ওই মেয়ের বিষাক্ত দৃষ্টিতে দেখা স্বাভাবিক। তার ওপর শুনেছে ও আমার ভাই, আর আমার আশ্রয়েই ছিল।

তবু আমার মেজাজের এমন ব্যতিক্রম ঘটে গেল কেন?

আসলে হু'হুটো মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ার দরুন আমার স্নায়ুগুলো নাড়াচাড়া খেয়েছে একপ্রস্থ। একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আর একটা আসন্ন। তারপর ভিতর দিয়ে এই অশান্ত যুগটা যেন আমার সামনে ·াদন করে দাঁড়িয়েছে। ওটা আমারই প্রতীক। তাই আমার ব ফলাফলও বুঝি খুব একটা তারতম্য হবে না।

আশ্রয়এরই মধ্যে কি দেখলে ভাল লাগত?

বিরজো রংয়ের স্নমনা মেয়েটি মোটামুটি স্নশ্রী, কিন্তু ঘাবড়েছি ভা· তার একটা রূপ আছে। ঘনপক্ষ্ম নিবিড় কালো এসব ছেলেকে ·াখের গভীরে তেমনি গভীর যেন কিছু ভাষা

আছে। এই বিশেষত্বটুকু গঙ্গার ধারের সেই এক রাতেও ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি। কেবল মনে হয়েছিল মেয়েটির মধ্যে কি যেন দেখার আছে।

হাসপাতালের হলে দূরে দাঁড়িয়ে আজ সেটুকুই লক্ষ্য করছিলাম। পাথরমূর্তির শোক স্তব্ধ দুটি চোখেও ওই ভাষারই একটা সমাহিত রূপ দেখেছিলাম। যে ভাষা সংযম জানে, আত্মস্থ হতে জানে, সুসঙ্গত বিশ্লেষণ জানে। অথচ আমার সামনে এসে দাঁড়ানো-মাত্র ওই ভাষা এমন উদগ্র কঠোর হয়ে উঠেছিল যেন আমিও খুনীর সাক্ষাৎ দোসর একজন।···তার বদলে যদি গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিত, দেখে যদি বুঝে নিত ওই পরিস্থিতিতে আমি শুধু অসহায় দর্শক একজন, তারপর আমার দিকে চেয়ে ওই দুটো কালো চোখে যদি একটা আর্ত প্রশ্ন ভেসে উঠত, এই নরকের কাল কবে শেষ হবে বলতে পারেন ? তাহলে···

কি তাহলে ? নিজের উদ্দেশেই দুবোধ্য একটা গালাগাল করে উঠলাম। হাসিও পাচ্ছে। কাকের শখ কোকিল হবে, কষাইয়ের শখ কবিতা লিখবে, আর আমি শীতল ঘোষ স্বপ্ন দেখব –তাহলে এই পর্যায়ের কিছু একটা দাঁড়ায়। রাবিশ- -

ওই ওরা নেমে এলো। গোমড়ামুখ পুলিস অফিসার, তার পাশে সুমনা। পিছনে বাকি ক'জন। আমি নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েও কি ভেবে গাড়ির গায়ে আরো বেশি করে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। এই সহজ নির্লিপ্ত ভঙ্গিটুকুর দরকার আছে মনে হল। ওপরে যে মেজাজ দেখেছি ভদ্রলোকের, এখানে দুটো চড়-চাপড় বসিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

সিঁড়ির পরেই গাড়ি-বারান্দা, তার গজ পনেরো এধারে আমার অবস্থান। মুখ তুলে পদস্থ অফিসারটি আমাকে দেখে পলকের জন্য থমকালো মনে হল। আমি গাড়িওলা লোক, ভাবেনি বোধহয় নিজের থেকেও আমি গাড়ির যত্ন বেশি নিয়ে থাকি কারণ ওটার

কল্যাণে অনেক সময় একটু বাড়তি মর্যাদা পেয়ে অভ্যস্ত। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হলেও ক্রিম রংয়ের এই তকতকে ছোট্ট যন্ত্রজীবটির সামনে দাঁড়িয়ে যে কেউ তার মুখখানা স্পষ্ট দেখে নিতে পারে। যদিও বাগে পেলে এইসব আইনরক্ষকরা আমার থেকে একশোগুণ শাঁসালো মক্কেলকেও ছারপোকার মত টিপে মারতে পারে, তবু আপাত সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে পলকের এই প্রাথমিক প্রভাবটুকু তুচ্ছ নয় মনে হল।

বেঁটে মানুষ, লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে হাজির হতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতে সিগারেট, অতএব স্বাভাবিক সৌজন্যের বশেই যেন অন্য হাতে পকেট থেকে সৌখিন সিগারেট-কেসটা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

—নো···থ্যাঙ্কস্।

জেরার সুরটা এবারে নরম হবে কি গরম হবে মুখের দিকে চেয়ে সেটা ঠিক করার আগেই আর এক অপ্রত্যাশিত প্রহসন। সাধারণ বেশ-বাসের যে-লোকটা একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি ডাক্তার কিনা, সে ঈষৎ ব্যস্ততায় খানিকটা এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে কি ইশারা করল। ফলে আমাদের সকলের চোখ তার দিকে।

পুলিস অফিসার কাছে এগিয়ে যেতে তাকে সঙ্গে করে লোকটা আমার গাড়ির উল্টো দিকের দরজার কাছে নিয়ে গেল। তারপর আধখানা ঝুঁকে কি দেখাল। চাপা ফিস্-ফিস্ শব্দে বলছেও কিছু।

পুলিস অফিসার দরজার কাছটা খুঁটিয়ে দেখছে। কৌতূহল চাপতে না পেরে এ-দিক থেকে আরো তুজন পুলিসের লোক ওদের দিকে চলে গেল। দরজা দেখা শেষ করে তারা বন্ধ দরজার কাচের ভিতর দিয়ে পিছনের সীটটা দেখতে লাগল। এত মন দিয়ে কি দেখছে তারা বুঝতে না পেরে আমি বিমূঢ়। আপনা থেকেই সুমনার দিকে চোখ গেল। তার মুখখানা শোকে পাথর কি প্রতিহিংসায়, ঠাওর করা শক্ত। সম্ভবত তুয়ের মিশেল। আমার বিরুদ্ধে জোরদার

কিছু একটা মিলেছে আঁচ করে সে-ও সোজা আমার মুখের দিকে তাকালো।

—কাম্ দিস্ সাইড প্লীজ।

পুলিস অফিসারের অকরুণ আদেশ। যন্ত্রচালিতের মত গাড়ির ওধারে এলাম। তারপর দৃষ্টিটা দরজার ওপর পড়তেই আমি হতভম্ব। ক্রীম-রংয়ের দরজার গায়ে শুকনো রক্তাক্ত তিনটে আঙুলের ছাপ। লক্ষ্য করলে একটুও অস্পষ্ট নয়।

মুহূর্তের জন্য মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সন্দিগ্ধ ধারালো জোড়া জোড়া চোখ আমার মুখের ওপর। সুমনাও এধারে চলে এসেছে। রক্তমাখা আঙুলের ছাপ দেখছে। এবারে আমাকে দেখছে। একটা চরম নিষ্পত্তি উপস্থিত, দেখাটা সেই গোছের।

—দরজা খুলুন।

অফিসারের কঠিন মুখ, কঠোর হুকুম। বড় দরের কোন আসামী অথবা তার একান্ত কোন দোসরকে হাতে-নাতে ধরা হয়েছে তাতে বুঝি আর সন্দেহ নেই।

পকেট হাতড়ে চাবি বার করলাম। সামনের দরজা খুলে পিছনের দরজার লকটা টানতে গিয়ে আবার এক ধাক্কা। গাড়ির রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ভিতরের সীটও চাঁপা রংয়ের তকতকে রেক্সিনে মোড়া, পিছনের সেই সীটের ওপরেও এক-চাপড়া শুকনো রক্ত। দগদগে ঘায়ের মত কলঙ্কচিহ্ন।

নব্ টিপে পুলিস অফিসার একটানে দরজা খুলে ফেলল। ভিতরে ঝুঁকল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার পাশ দিয়ে আরো দুজন সতীর্থ ভিতরের দিকে গলা বাড়াতে চেষ্টা করল। বাকি দুজন পুলিসের লোক আমার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আমাকে আগলে রাখার কর্তব্যবোধে হয়তো। হঠাৎ ছুট লাগাতে পারি, অথবা আচমকা পকেট থেকে কিছু বার করে বসতে পারি তো।

বড় অফিসারটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ধপধপে সাদা

রুমাল বার করে দ্বিতীয় আঙুলে জড়াবার ফাঁকে আমার মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হানল একদফা। তারপর ভিতরে এক পা তুলে দিয়ে সীটের ওপর ঝুঁকল। অতি সন্তর্পণে রুমালে জড়ানো আঙুলের মাথাটা ওই চাপড়া দাগের একধারে আলতো করে ঘষল একটু।

···পিছনের নরম গদির ওই জায়গাটুকু এখনো ভাল করে শুকিয়েছে কিনা সন্দেহ। আঙুলের মাথায় রক্তের দাগ উঠবেই।

মাথাটা শুধু বন বন করে ঘুরছে না, চোখেও ঝাপসা দেখছি। সমস্ত দিন পেটে পড়েনি কিছু, সকালে বেরুনোর তাড়া ছিল. সেই মুখে শ্রীপতি ব্যাটা একরাশ খাবার নিয়ে হাজির হবার ফলে ধমক খেয়ে ফিরেছে। ···একটু জল পেলেও হত। আত্মস্থ হবার তাড়নায় মুখ তুলেছি। সামনে সুমনা। বিমূঢ় দৃষ্টিটা ওর অপলক চোখের কালো তারার সঙ্গে ধাক্কা খেল একপ্রস্থ।

···কিন্তু পরমুহূর্তে এ-কী কাণ্ড! আমি স্বপ্ন দেখছি না আর কিছু? না, এই সংকটে পড়েও একবার ঈশ্বরের নাম জপিনি। ওই ভদ্রলোকের অস্তিত্ব কোথাও আছে কি নেই তা নিয়েও মাথা ঘামানোর স্পৃহা কখনো হয়নি। রমণীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা টেনে আমার ফাঁকে কোন্ ষষ্ঠ চেতনার প্ররোচনায় তার কাঁধের ওপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়েছিলাম জানি না। কি দেখলাম? সত্যি দেখছি না বিকারগ্রস্ত ভ্রম কিছু? ঈশ্বর জানি-না মানি না, কিন্তু এমন বিস্ময়কর নাটকও দুনিয়ায় ঘটে!

···দূরে হাসপাতালের লাল ফটক পেরিয়ে একটা লোক তার নিজের দেহের বোঝা টেনে টেনে সামনের দালানটার দিকে চলেছে।

···এই মুহূর্তে এমন বাঞ্ছিত আর বুঝি কেউ নয়। চোখে আর একটুও ঝাপসা দেখছি না।

হয়তো বা মাত্র মিনিট-খানেকের অবকাশে এই অনুভূতির ওলট-পালট। আঙুলে জড়ানো সাদা রুমালের মাথায় রক্তের দাগ তুলে নিয়ে পুলিস অফিসার নিজে পরখ করেছে, তারপর সঙ্গীদের দেখাচ্ছে

আমার মুখোমুখি ফিরল। —ব্লাড দেন···ইজ্‌ণ্ট ইট্?

মাথা নাড়লাম। তাই।

চাপা হুঙ্কারে ফেটে পড়ল ভদ্রলোক, কোথায় কাকে কি-ভাবে ডিসপোজ্‌ করা হয়েছে?

হায় রে কপাল, এই বুদ্ধির সব মানুষ নিয়ে সমাজের আবর্জনা দূর করার স্বপ্ন দেখছে ইন্দিরা গান্ধী! দেশে এখনো প্রেসিডেন্ট রুল কায়েম, তাই ওই মহিলার নাম স্মরণে এল। মগজ সাফ এখন, মুখের ওপর রসিকতা করা যেত, মশাই যা ভাবছেন তা সত্যি হলে এখানে আসার আগেই ও-সব রক্তের দাগ-টাগ লোপাট হয়ে যেত।

···ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে সেই লোকটাকে দেখালাম। অবশ ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ টেনে টেনে সে তখন ওদিকের আউটডোরের আধা-আধি এগিয়েছে। —আপনার সহকর্মীদের পাঠিয়ে এই লোকটাকে ধরে আনুন, সব জবাব ওর কাছ থেকেই পেয়ে যাবেন

অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখল খানিক। তা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ মীন—ও কে?

—পকেটমার। নিজের অগোচরে গলার স্বর এবারে আম বদলাল একটু। —দেখুন সার, এখনো আমার খাওয়া-দ পর্যন্ত হয়নি, এই অবেলায় এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে রসিকতা করছি না। গাড়িতে রক্তের দাগ কেন জানতে যদি, লোক পাঠিয়ে ওই লোকটাকে ধরে আনুন।

লক্ষ্য করলাম সুমনাও চেয়ে আছে আমার দিকে। চাউ এবারে ঈষৎ যেন বিভ্রান্ত। এদিকে অফিসারের উগ্র মূর্তি দেখে ভয় ধরল এই বুঝি গালে বসিয়ে দিল এক ঘা। কিন্তু আমারও উক্তির মধ্যে পুরুষোচিত কিছু ছিল বোধহয়। ভদ্রলোকের অসহিষ্ণু দৃষ্টিটা সঙ্গীদের দিকে ঘুরল। ইশারায় হুকুম দেওয়ামাত্র চারজনের মধ্যে তিনজনেই নির্দিষ্ট লোকটাকে ধরে আনতে ছুটল। আর তক্ষুনি পুলিস অফিসারের সহজাত সংশয়-প্রবণতার দরুন দু'হাত কোমরে

উঠল, ডান হাতটা কোমরের বেল্টসংলগ্ন রিভলবারের ওপর। অর্থাৎ আমি ভাঁওতা দিয়ে এই ফাঁকে কিছু একটা করে বসার মতলব এঁটে থাকলে সে-ও প্রস্তুত।

একটু বাদেই ওই তিনজন লোক আধমরা মানুষটাকে হিড় হিড় করে টেনে আমাদের সামনে উপস্থিত করল। রাস্তার কল থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে থাকবে, সেই জলে রক্তমাখা জামাটা আরও জঘন্য দেখাচ্ছে। দু'চোখ টান করে লোকটা আমাদের দেখল একবার। আবার একটা হামলার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু প্রাণের কি বিচিত্র মায়া মানুষের, কৃপার আশায় দু'হাত জোড় করে সন্ত্রাসে চেয়ে রইল।

—এ অবস্থা কেন? পুলিস অফিসারের চাপা হুমকি।

লোকটার ভয়ার্ত দু'চোখ একবার আমার দিকে ঘুরল। কেন আবার তাকে ধরে আনা হয়েছে জানে না, কতটুকু বলা নিরাপদ তাও না। করুণ জবাব দিল, পাপের ফল হুজুর···

অসহিষ্ণু পুলিস অফিসার পেল্লায় এক চড় তুলতে লোকটা এক পা পিছু হটতে চেষ্টা করল। চড়টা আর বর্ষণ না করে ভদ্রলোক ফের জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ঠিক ঠিক বল, পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে?

···হ্যাঁ হুজুর, অভাবের দায়ে কাঁচা হাতে···সত্যি বলছি হুজুর··· সকলে মিলে মাথা ভেঙে দিয়েছে, নাকের হাড় ভেঙে দিয়েছে, এই দেবতা ওনার গাড়িতে আমাকে টেনে না তুললে একেবারে মেরে ফেলত···উচিত সাজা মিলেছে হুজুর···আর কক্ষনো এ-কাজ করব না।

ওর মুখে দেবতা শুনে এবারে কিন্তু আমার একটুও রাগ হল না। এই উক্তি থেকে লোকটাকে আমার একটু উদ্ভট গোছের ভাবা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সুমনা মেয়েটি এবারে আমার দিকে তাকিয়েছে, দয়া করে একটা পকেটমারকে নিজের গাড়িতে তুলে নেয় যে, কোনরকম

ন-খারাপীর ব্যাপারে তার সমর্থন থাকা স্বাভাবিক কিনা ভাবছে য়তো। কিন্তু পুলিসের লোক এত সহজে ভোলবার নয়। আমাকে খিয়ে খুব চাপা ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এই দেবতা তোমার না লোক তাহলে ?

—না হুজুর, আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ভগবান ওঁকে—

হাত উঁচিয়ে ভদ্রলোক আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, শালা ভগবানের ার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, দেব একেবারে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে— জিগেস করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দে, ওঁর এই গাড়িতে তুই ঠেছিলি ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—কখন ?

—ঘণ্টাটাক হবে।

—গাড়িতে কোথায় বসেছিলি ?

—ওঁর পিছনে।

—রক্ত পড়ছিল ?

—রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম হুজুর।

—তোকে কোথায় নামানো হয়েছে ?

হাত তুলে দিকের হদিস দিল, ওই ও-দিকে মাঠের ধারে হুজুর—

যে তুজন লোক ধরে এনেছিল, তাদের দিকে চেয়ে চোখের শারায় ওকে অব্যাহতি দিতে বলে অফিসার আমার দিকে ফিরল। াই ফাঁকে ওই তুটো স্বল্প-পদস্থ পুলিস আধমরা মানুষটাকে এমন ক ধাক্কা মারল যে লোকটা আট-দশ হাত ছিটকে গিয়ে মাটির পর বসে পড়ল। ...খানিক আগে হাসপাতালে অতগুলো মুর্ষু রোগীর মাঝে এক ছেলের নৃশংস অকালমৃত্যু দেখে আর রেক ছেলেকে মৃত্যুশয্যায় ধুঁকতে দেখেও আমার চিত্ত তেমন চলিত হয়েছিল মনে হয় না। অথচ ওই কাণ্ড দেখে লোক টার মুখ মাটিতে থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার।

পিছনে কি ঘটল জ্রক্ষেপও না করে পুলিস অফিসার গুরুগম্ভী
মুখে আমার ওপর চড়াও হল। —আপনি কি করেন?

—দালালী।

ভদ্রলোক থমকালো একটু। চকিতে চকচকে গাড়িটার দি
তাকিয়ে নিল একবার। চাউনিটা মুখের ওপর স্থির আবার, গল
স্বর নীরস। —কিসের দালালী?

—এনিথিং। জমি বিক্রি, বাড়িঘর বিক্রি, জুয়েলারি কে
বেচা, সবেতে আমার ইন্টারেস্ট আছে।

ভাল পাড়ায় আলাদা ফ্ল্যাটে থাকি, অফিস কোয়ার্টার্স নি
নামে ঘর আছে, সেখানে টেলিফোন, তার ওপর এই গাড়ি।
মিলিয়ে পুলিসী বিবেচনায় কোথায় যেন একটা গরমিল ঠেক
বেঁটে মানুষের থলথলে মুখখানা রোদে আর গরমে লালচে দেখাে
গোল গোল দুই চোখ আমার মুখের ওপর চড়াও হয়ে আছে।

—আপনাকে একবার থানায় আসতে হবে।

আঁতকে উঠলাম প্রায়। —এখন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার প্রচণ্ড অসুবিধে হবে। এখন পর্যন্ত আ
খাওয়া-দাওয়া হয়নি, সন্ধ্যার পরে যেতে পারি। কাল সকালে হ
ভাল হয়, মানে যদি যেতেই হয়, তাহলে—

মেজাজ কতটা চড়ানো যেতে পারে অথবা কতটুকু সে
দেখানো যেতে পারে ভদ্রলোক তার হিসেব কষছে মনে
হিসেবটা আমার অনুকূল হবে মনে হল না। মরীয়া হয়ে
শেষ অস্ত্রটি নিক্ষেপ করতে হল এবার। খুব নরম করে বল
ওই পকেটমারটার আমি চেনা লোক কিনা জিজ্ঞেস করছিলে
আপনার দরকার হলে জনাকতক চেনা লোকের নাম বলতে প
তাঁরা বা তাঁদের স্ত্রীরা হয়তো কেউ খুব বিপজ্জনক মানুষ ব
না আমাকে।

ভদ্রলোকের লালচে মুখখানার প্রতিক্রিয়া যেন কিছু শোনার ন্যই থমকে রইল। গড় গড় করে পাঁচ-ছ'টি ভদ্রলোকের নাম রে দিলাম। দেশের মন্ত্রিসভা বাতিল, শাসনের চাকা ঘুরছে রকারী আমলাদের মর্জিমাফিক, অতএব সম্ভ বর্তমানে এই নাম-লোর ওজন কম নয়। বিভিন্ন প্রশাসনক্ষেত্রের এঁরা মোটামুটি মরা-চোমরা ব্যক্তি। পুলিসের মাথার দিকের একটা বিশিষ্ট মও জুড়ে দেওয়া গেছে। উপসংহারে জানালাম এঁদের আর দের ফ্যামিলির সঙ্গে আমার অনেক দিনের যোগ।

কাজ হল। চেষ্টা করে ভদ্রলোক বিরস বদনখানা একটু ঠাণ্ডা রে নিল। —ঠিক আছে, কাল সকালেই আসবেন। চটপট য়েটি অর্থাৎ সুমনার' দিকে ঘুরে দাঁড়াল। —পোস্ট-মর্টেম সেরে ডি পেতে পেতে কাল বিকেল গড়াবে হয়তো, আমি চেষ্টা করব তে তাড়াতাড়ি হয়, তুমি কাল একবার এসো।

'তুমি' শুনে আবার একটু কৌতূহল নিয়ে তাকালাম দুজনের কে। বছর পঁয়তাল্লিশ হবে অফিসারটির বয়েস, আর ঐ মেয়ের ড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। তা হলেও আগের চেনাজানা না কলে ওই বয়সের কোন মেয়েকে 'তুমি'তে টেনে আনা সহজ নয়।

হন হন করে ভদ্রলোক সামনের দিকে পা বাড়াল। অদূরের কটা শেডের নীচে তার জীপ দাঁড়িয়ে। বাকি ক'জনও তাকে নুসরণ করল।

··এখানে আমি আর ওই মেয়ে আর হাত দশ-বারো দূরে ওই কেটমার। ব্যাটা মাটি ছেড়ে ওঠেনি এখনো, বসে ফ্যাল ফ্যাল রে এদিকেই চেয়ে আছে। শোকের সঙ্গে কর্তব্যের অনেকখানি ড়তি বিড়ম্বনা যুক্ত হলে যেমন হয়, মেয়েটির স্তব্ধতার তলায় তলায় ই গোছের ক্লান্তির ছাপ। আস্তে আস্তে আমার দিকে ফিরল·তেমন কবার, সোজা মুখের দিকে তাকাল, তারপর চলে যাবার উপক্রম। লী.

—শুনুন, আমার নাম শীতল ঘোষ, ঘটনাক্রমে ওই রমেন ঘোষের

জ্যাঠতুতো দাদা, এর বেশি অপরাধ কিছু নেই। আচ্ছা, ও
ছেলেটি কি আপনার ভাই ?

সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। ভাই ধরে নিয়ে আবা
বললাম, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যাপার চলেছে একেবারে, দু-দুটো অমূ
কচি প্রাণ নষ্ট, বড় দুঃখের কথা।

—আপনার ভাই পুলিসের হাতে জখম হয়েছে ?

গলার স্বর বা বলার ভঙ্গিটুকু খুব রূঢ় না হলেও সদয়ও ন
আদৌ। অর্থাৎ কচি প্রাণের দুর্ঘটনা দুটোকে এক পর্যায়ে ফে
যেতে পারে না।

—জানতুম না। ···ওই পুলিস অফিসার শুধু জেরাই করলে
কিছু বলে গেলেন না। ···যতদূর মনে পড়ে আপনার নাম সুম
··সুমনা কি ?

কালো দুটো চোখ মুখের সঙ্গে আটকে থাকল খানিক
আমার চোখে তাতেই যেন একটা অনভ্যস্ত অনুভূতির ছোঁ
লাগল।

—দাশগুপ্ত। শোক ভুলে চোখে চোখ রেখে এই মুহূ
স্মৃতির দোর ঠেলছে মনে হল।

—এর আগে আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি ?

—মাস দুই আগে গঙ্গার ধারে। ···অবশ্য আপনি ঠি
দেখেছেন কিনা বলা যায় না, গাড়ির ভিতরটা আবছা অন্ধকার ছি
···আপনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে মণি
—মণিলাল সেনশর্মাকে দেখে আপনি গাড়ি থামিয়ে উঠে বসেছিলে
আর বাস-স্টপ পর্যন্ত এসে নেমে গেছলেন।

এতটা বিশদ করে বলা নিতান্ত অশোভন, বিশেষ করে এ
পরিবেশ আর পরিস্থিতিতে, যেখানে খানিক আগে মাত্র ওই মে
এক আপনার জনের মৃত্যু জমা দিয়ে এসেছে। তবু কথাগু
যেন মুখ দিয়ে অনেকটা আপনা থেকেই গড় গড় করে বেরিয়ে গেল

সম্ভবত দুটো কারণে। শোক সত্ত্বেও মেয়েটিকে আত্মসচেতন মনে হয়েছে। ···দোতলার ওই ঘরে ছেলেটা শেষনিশ্বাস ফেলার পরেও যদি একে ওই শয্যায় লুটিয়ে পড়তে দেখতাম, যদি ফুলে ফুলে কাঁদতে দেখতাম—স্বাভাবিক মনে হত। ···পাথরমূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল, বেশি শোকেও ওইরকম হয় শুনেছি, কিন্তু আমার তাও মনে হয়নি। দ্বিতীয় কারণ, তার পরের ব্যাপারটা। পুলিস অফিসারের পিছনে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। শোকের বদলে তখন ওই স্তব্ধ চোখে-মুখে একটা হিংস্র আক্রোশ জমাট বেঁধে ছিল। সেই নিঃশব্দ ঝাপটায় আমারও স্নায়ুগুলো খুব সুস্থ ছিল না।

আমার কথাগুলো শুধু কান দিয়েই শুনল, কোনরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না। আর একটু দেখে নিয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করতে সহজ ভদ্রতার সুরে বললাম, আপনি কোথায় যাবেন চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ। অস্ফুটস্বরে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে সামনের দিকে এগলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলাম। চলার ভঙ্গী ধীর মন্থর। মণিদার রসিকতা মনে পড়ল, একটু স্বাস্থ্যবতী হলে পিছন থেকে মেয়েদের বেশ দেখায়। সাদা বেশবাসে নিজের চারদিকে একটা বিচ্ছিন্ন গণ্ডী রচনা করে পথ ভাঙছে যেন। এই দৃশ্য দেখলে মণিদা কি বলত জানি না। কিন্তু নিজেরই ভিতরের একটা অভিলাষের মূর্তির আভাস পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছি। ···ভিতরের কেউ ওই বিচ্ছিন্নতার গণ্ডীটা কি এক রূঢ় অসহিষ্ণুতায় ভেঙে উবিয়ে দিতে চাইছে? ওই সাদা বেশবাসের মেকি ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

নিজের ভিতর দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আত্মস্থ হওয়া গেল। গাড়িতে লিফ্‌ট্ পাওয়াটা ওই মেয়ের কাছে তেমন লোভনীয় কিছু নয়। ···গঙ্গার ধারে সেদিনের সেই অবাঙালী ভদ্রলোকের গাড়িটা এটার থেকে ঢের ঢের দামী ছিল।

হঠাৎ মনে হল, মণিদার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া খুব দরকার।

দর্শন-তন্ময়তায় বিঘ্ন ঘটল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, মাটিতে তেমনি হাত-পা ছড়িয়ে বসে পকেটমার ব্যাটা ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকেই চেয়ে আছে।

গলা দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বার করে গাড়ির দিকে এগোলাম।

—বাবু!

ঘুরে দাঁড়াতে লোকটা সানুনয়ে বলল, আপনার দয়া জীবনে ভুলব না···একটা কাজ-টাজ দেবেন? মা-কালীর দিব্যি বাবু, খেতে পরতে পেলে এ-সব নোংরা কাজ আর করব না।

গম্ভীর শ্লেষে বললাম, একদিনের মারের চোটে এত সুমতি?

আশ্চর্য, মারের ধকলে এখনো সর্বঅঙ্গ ঝাঁঝরা হয়ে আছে হয়তো, তারই মধ্যে দাঁত বার করে হাসতেও পারল লোকটা। লোকটা বলছি কেন, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের শক্ত-সমর্থ ছোঁড়াই একটা। ভিতরের গুণাবলী জানা না থাকলে পরনের ট্রাউজার আর গায়ের জামা দেখলে 'আপনি' ছেড়ে কেউ 'তুমি' বলবে না। হেসে জবাব দিল, মারধোর আরো অনেক খেয়েছি, এর থেকে ঢের বেশিও খেয়েছি, সে জন্যে নয়, আসলে ঘেন্না ধরে গেছে—মাইরি বলছি সার, বিশ্বাস করুন, এককালে গেরস্ত ঘরের ছেলে ছিলাম, আমার নাম চঞ্চল চাটুজ্যে—খেলাধুলোয় পাড়ার মধ্যে সেরা একজন ছিলাম, কিন্তু পড়াশুনা হল না বলে সব কিছুতেই চোনা—পড়া হবে কি করে, নিজেরও মতি ছিল না আর ইস্কুলের মাইনে চাইলে গাঁজাখোর বাপ চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করত।

দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা। সেখানে হরেক রকমের জীব। এই জীবটির বাক্যালাপে একটু বৈচিত্র্যের ঘ্রাণ পেলাম। ক'জন ভদ্রলোক একটা পকেটমারের খোশগল্প বা তার মনের কথা শোনার সুযোগ পায়?

বললাম, মনের দুঃখে শেষে এই পথ ধরলে ? এক ধার

জবাব দিল, সত্যি কথা বলছি সার, সঙ্গদোষে। শালাদের শ। কারোরই তেমন সাহস নেই, কি করব। যাদের একটু-আধটু সাহস আছে তারা এই ব্যবসারই বড় দল গড়েছে নয়তো অন্যের দলে ভিড়েছে। আমার ঘোড়ার ডিম ভালও লাগে না আবার ছাড়তেও পারি না, খরচাও তো আছে···

বাক্যালাপ সরস লাগছে বেশ। জিজ্ঞেস করলাম, ভাল লাগে না কেন, রোজগারের তুলনায় মারটা বেশি হয়ে যাচ্ছে ?

ও দরদী মানুষই ধরে নিয়েছে আমাকে। মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না সার সে-জন্যে নয়, ভালই লাগে না। ধরা পড়লে মারধোর তো আছেই, যে কর্মের যেমন ফল—কিন্তু কপালে থাকলে থোক রোজগারও কম হয় না। এই তো ছ'সাত মাস আগে একজনের আস্ত মাইনের খামই মেরে দিয়েছিলাম, গায়ে আঁচড়টিও পড়েনি·· পরে খাম খুলে নিজেরই চক্ষু ছানাবড়া—করকরে এগারো শ' টাকা। যা আনন্দ হল সার, ভাবলাম ভগবান মুখ তুলে চেয়েছে, এবারে আর কিছু না হোক একটা পান-বিড়ির দোকান দিয়ে অন্তত বসতে পারব—

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বোধহয় মনে পড়ল। একটা ক্রূর ক্লেদ যেন আহত মুখ বেয়ে কোটরাগত দুই চোখের দিকে ধাওয়া করল। ঘাড় ফিরিয়ে দূরের ফটকের দিকে তাকাল। শ্বেতবসনা সুমনা দাশগুপ্ত ততক্ষণে ওই গেট অতিক্রম করলেও তখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তাকে। আমার দৃষ্টিও আপনা থেকে সেই দিকেই ঘুরেছে।

একটু বাদেই মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। শ্রীমান চঞ্চল চ্যাটার্জী আমার দিকে ফিরল আবার। একটা শুকনো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্ষোভ ঝরে পড়ল, বিষণ্ণ চোখে আর এক ধরনের আগ্রহ।— একটা কথা বলব বাবু ?···আপনি বড় ভাল লোক···ওই মেয়েমানুষ জাতটাকে কক্ষনো বিশ্বাস করবেন না, করলে পস্তাতে হবে।

হুইকেটমারের আন্তরিক উপদেশ শুনে কান জুড়লো। ওই যে শ্রীমতী চলে গেল তার সঙ্গে আমার কিছু মনের ব্যাপার অথবা মানের ব্যাপার আছেই ধরে নিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ওই এগারো শ' টাকা তাহলে এই ভুলেই ফাঁক হয়ে গেছে?

শরীরের আপাত যন্ত্রণার থেকে স্মৃতির যন্ত্রণাটাই বেশি যেন। রাগে আহত মুখটা ঈষৎ বিকৃত। বিড় বিড় করে বলল, সবটা নয়, অর্ধেকটা। বিশ্বাস করে হারামজাদীকে ওই টাকার কথা বলেছিলাম, ভেবেছিলাম, শুনলে শ্যামাপদকে ছেড়ে গোটাগুটি আমার দিকে ঢলবে। শ্যামাপদ এসে ছোরা উঁচিয়ে অর্ধেক টাকা খসিয়ে নিয়ে গেল, বললে পাপের টাকার ভাগ দেশের কাজে না ঢাললে খুন হয়ে যেতে হবে।

—দেশের কাজে মানে?

—বোমা বানানোর কাজ। ওই বজ্জাতকে নিয়ে সেই রাতেই হাওয়া। একবার পেলে হয়, দুটোকেই জ্যান্ত পুঁতব, হঠাৎ ঘাবড়ে গেছলাম বলে...

রাগ আর আক্ষেপ দেখে মনে হবে সদ্য সদ্য ঘটেছে ব্যাপারটা। বললাম, পান-বিড়ির দোকান তো বাকি 'সাড়ে পাঁচশো' টাকাতেও হতে পারত।

—কি করে হবে বাবু, মেজাজটা তখন একেবারে খিঁচড়ে গেল যে। বাকি টাকা নেশা করেই ফুঁকে দিলাম। ...আজ আপনার দয়া পেয়ে ভেতরটা আনচান করছে, যা-হোক একটা কাজ দিন না বাবু...আপনার এই গাড়ি ধোয়ামোছার কাজও করতে পারি, দু'বেলা শুধু দু'মুঠো খেতে পেলেই বর্তে যাব।

বাক্যালাপের আগ্রহ ফুরাল। জবাব না দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আর কোন আবেদনের অবকাশ না দিয়ে একটু বেগেই বেরিয়ে গেলাম। মন বলছে সুস্থ পথে চলার মত উপাদান হয়তো ওর মধ্যে এখনো আছে...কিন্তু চালায় কে? চুলোয় যাক।

গাড়ির বেগ আপনা থেকেই কমে এল। রাস্তার এক ধার ঘেঁষে সুমনা দাশগুপ্ত হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গীটুকু সত্যি বেশ। সুঠাম আত্মস্থ গোছের। পাশের সীটে টেনে তোলার ইচ্ছেটা মনের তলায় ঘুরপাক খেয়ে গেল। পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে গাড়িটা প্রায় থামিয়েই দিলাম। তারপর ঘুরে তাকালাম, অর্থাৎ মত বদলে এখনো উঠে আসা যেতে পারে।

মত বদলানোর লক্ষণ দেখা গেল না। উল্টে এই আচরণে আরো বিরক্ত গম্ভীর। কালো চোখের তারায় রূঢ় প্রত্যাখ্যান। না, ঠিক শোকের মুখ নয়, শোকের জবাব দেবার জন্য বদ্ধপরিকর যেন। ঘটনার সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভাই যুক্ত তাই একটু তোয়াজের ইচ্ছে ধরে নিয়েছে হয়তো। ড্যাম ইট--

গাড়িটা ছোটখাট একটা আর্তনাদ করে উঠে শাঁ-শাঁ ছুটল।

কাকা উকিল। নীচের তলায় একদিকে তার সেরেস্তার সামনের দেয়ালে কাঠের সাইনবোর্ড ঝুলছে—সুবিমল ঘোষ, এল. এল বি, অ্যাডভোকেট।

এমনিতে বুদ্ধিমান মানুষ। এক সময় বেশ পসার ছিল। আমার ধারণা, কাকার বুদ্ধিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে সাদা রাস্তায় চললে পসার আরো বাড়ত। কিন্তু লক্ষ্য থেকে লোভটা বড় করে ফেলে ভদ্রলোক নিজেই নিজের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ফলে তার হৃদযন্ত্রটি পরিপুষ্ট ছিল না তেমন। সেটা টের পেয়েছে বছর কয়েক আগে হঠাৎ জোরালো এক স্ট্রোকের ঘায়ে। চেষ্টা-চরিত্র করে প্রাণে বেঁচে উঠেছে, কিন্তু দেহের একটা দিক বিকল তখন। দীর্ঘদিনের সেবা-সুশ্রুষার ফলে এখন চলা-ফেরা করতে পারে, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে নয়। কোর্টে যায়, নিজে বিশেষ সওয়াল করতে পারে না, সব ব্যাপারে জুনিয়রদের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাইরে তাদের তোয়াজ-তোষামোদ করে চলতে হয়, ভিতরে ভিতরে সদা সন্দিগ্ধ।

আগের চার ভাগের একভাগ রোজগার এখন। সুদিনে ঘটা করে একে একে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, এই দুর্দিনের কথা ভাবেনি। সঞ্চয়ের একটা মোটা অংশ সেই খাতে বেরিয়ে গেছে। তারও আগে এই বাড়িটা করার তাগিদে আর কাকীমার মনের মত বাড়ি সাজানোর ঝোঁকে সঞ্চিত তহবিলের অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেছল। আচমকা ওই অঘটনের ফলে চিকিৎসার ব্যয় সামলাতে চোখে অন্ধকার দেখার দাখিল। বাড়ির তিনতলা আর একতলার খানিকটা অংশ এখন ভাড়াটের দখলে। তিনতলার ভাড়াটে তারই বড় মেয়ে, সেই

কারণে ভাড়াও আশানুরূপ নয়। নিজের গাড়িখানা বেচে দিতে হয়েছে, ফলে কোর্টে যাতায়াতের প্রবল সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যও এই ভাইপোর ডাক পড়েছিল। আমি যদি কাকাকে কোর্টে পৌঁছে দিই আর নিয়ে আসি। কাকা তেলের খরচা দিতে প্রস্তুত।

···মাত্র সাড়ে-সাত হাজার টাকায় এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়িটা কেনার পর থেকেই কাকা আমাকে একটু সুনজরে দেখা শুরু করেছিল। অবশ্য এই দামের গাড়ি কেউ জানে না, বললেও বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ। কাকার ধারণা, নিজের খরচ চালিয়ে গাড়ি কিনতে পেরেছি যখন, ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে। গাড়ি কি অবস্থায় কেনা হয়েছে, কেন কেনা হয়েছে, আর কি-ভাবে কেনা হয়েছে সে শুধু শীতল ঘোষই জানে। কাকার প্রস্তাব বাতিল করতে একটুও সময় লাগেনি আমার। বলেছি, তোমার তাহলে সপ্তাহে চারদিন কোর্টে যাওয়া হবে না বা কোর্ট থেকে ফেরা হবে না। আমি কোনদিন কোথায় থাকি তার কিছু ঠিক আছে? সময় ধরে বেরিয়ে শেয়ারের ট্যাক্সিতে যাতায়াত কর।

···কাকা দ্বিতীয় দফা আমার শরণাপন্ন হতে চেষ্টা করেছিল তার ছেলে এই রমেনের ব্যাপারে। তার এক ডাকে আমি গিয়ে হাজির না দিলে সেটা রাগের কারণ হত। যে-ভাবে আমাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু শীতল ঘোষের নির্লিপ্ত যুক্তিটা অন্য ধাঁচের। যম আমাকে ডাকেনি, উল্টে আমিই যমকে ডেকেছিলাম। এর মধ্যে কাকার নাক গলাতে আসার কোন দরকার ছিল না। জীবন আর মৃত্যুর টানাহেঁচড়ার ফলে অবস্থা আরো প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল। সরাসরি যমের খপ্পরে পড়ার বদলে তার কাছাকাছি পৌঁছনোটা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। তার থাবার ঘায়ের সেই স্মৃতি ভয়াবহ। ওই কাকার জন্যই মৃত্যুর চিন্তাটা এখন ত্রাসের কারণ আমার। তাছাড়া

কাকা কেন হঠাৎ অতখানি উদার হয়ে উঠেছিল তখন, আমার নীরব চিন্তায় সেটাও খুব অস্পষ্ট নয়। ···দুর্বলচিত্ত মানুষ অনেক সময় নিজের বিবেকের উৎপাতে উৎকণ্ঠিত হয়। সেটাকে বুঝ দেবার জন্যই কখনো-সখনো বদান্য হয়ে ওঠার দরকার হয়ে পড়ে। আমার নিরুত্তাপ বিশ্বাস, সেই দুর্যোগে কাকা পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজের বিবেকের আঁচড়ের ওপরে প্রলেপ দিয়েছে শুধু। তার বেশি কিছু নয়।

···সেই সব পুরনো স্মৃতির ওপর আমিও পাথরচাপা দিয়েছি।

যা বলছিলাম, ডাকা-মাত্র সাড়া না পেলে অর্থাৎ গিয়ে উপস্থিত না হলে কাকা এখন আর রাগ করে না। অনুকূল বুঝলে বড়জোর একটু-আধটু অভিমান প্রকাশ করে থাকে। তার ডাকার রীতিও বদলেছে ইদানীং। প্রথমে একটা-দুটো পোস্টকার্ড ছাড়ে। পরে বড় নাতনী মিমিকে পাঠায়। মৃন্ময়ীর অপভ্রংশে মিমি। বড়দি অর্থাৎ কাকার বড়মেয়ের প্রথমা। কাকার ধারণা, এই ভাগ্নিটিকেই ভাইপো যা একটু ভালবাসে। ওকে শিখিয়ে দেয় হয়তো, মামার দেখা পেলে একেবারে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসবি।

মিমি এসে তাই করে। ভালবাসা-টাসা শীতল ঘোষের মরে গেছে, তবে বড়দির এই মেয়েটাকে একসময় পছন্দ করতাম বটে। মোটাসোটা ঢলঢলে আদুরে মেয়ে ছিল, এখনো অনেকটা সেইরকমই আছে। বছর আঠেরো বয়েস, কলেজে ঢোকার মুখে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। মিমিরও বিশ্বাস মামা এখনও ওকে খুব ভালবাসে। নিজের মামাটি অর্থাৎ রমেনের সঙ্গে ওর শুধু ঝগড়া আর মারামারির সম্পর্ক ছিল যখন 'শেতল' মামা সর্বদাই তখন ওর পক্ষ নিত। কলেজে ঢোকার পর থেকে ওর একলা চলা-ফেরার পা হয়েছে, তাই যখন-তখন এসে হাজির হতে বাধা নেই। কিন্তু মামার আসল ভিতরটা দেখতে পেলে ও এ-দিক মাড়াতো কি না সন্দেহ। দয়া করে সেটা দেখতে দিইনি। মেয়েটাকে কোথাও সরিয়ে ফেললে

ওর স্বার্থ- খা মায়ের মুখখানা কেমন দেখতে হয়, তার বুকের তলায় কি-রকম ে াকের ঝড় ওঠে সেটা দেখার লোভও অনেক সময় মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দেয়। চিন্তার বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন হলে শেষে নিজের ওপরেই চাবুক চালাতে হয়।

…মিমির কৃতিত্বে সেবারেও ভাইপোর দেখা পেয়ে নিজের গলার স্বর কাকা আধখানা ভেঙে দিয়েছিল। বলেছিল, শরীরের এই হাল, তার মধ্যে অশান্তির শেষ নেই, তোকে আমি নিজের বড়ছেলে ভাবি, আর তুই একবার ফিরেও তাকাবি না ?

একটা বিরক্তি যেন গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল। কাকীমাও মুখখানা এমন করে বসে ছিল যেন বুক-নিঙড়ানো উক্তিই কিছু করা হয়েছে। এর থেকে এঁরা যদি সরাসরি স্বার্থের প্রসঙ্গে চলে আসত, এ-রকম অসহ্য লাগত না।

—কি ব্যাপার বলে ফেল।

এ-রকম করকরে ভাবটা তাদের পছন্দ নয়। কিন্তু পছন্দের দিন আর নেই বলেই তো আমাকে ডাকা। অতএব ভণিতা বাদ দিয়ে কাকা কাজের কথা বলেছে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, ছেলের জন্য দুর্ভাবনা। ছেলের সম্পর্কে কাকীমারও কিছু মোহভঙ্গ হয়েছিল, নইলে নীরবে সায় দেবার জন্য অমন মুখ করে কাকার পাশটিতে বসে থাকত না। এমন কি সমস্যার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য চির-স্বার্থপর বড়দি পর্যন্ত নীচে নেমে এসেছিল।

কাকার বক্তব্য, অসময়ে ছেলেটা পড়াশোনায় জলাঞ্জলি দিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে কে জানে। তার চালচলন মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না। যত সব বাজে ছেলে আর বাজে লোকের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা, এর একটা বিহিত না করলে আহার-নিদ্রা ঘুচতে চলেছে সকলের। উপসংহার, ও নিজের ভবিষ্যৎ ভাবছে না বলে সকলেরই চোখ বুজে থাকলে চলে কি করে ?

অসহিষ্ণু বিরক্তিটা আবারও ওঠা-নামা করছিল,ার নরও ঠেলে
সেটাকে নীচের দিকে পাঠাতে হয়েছে। শ

—আমাকে কি করতে হবে তাই বল ?

পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় একেবারে হাল ছেড়ে কাকা বলেছিল,
রমেনের ঘরে মন টেকে না, তোরও শুনি বাইরে ঘোরাঘুরি কাজ
—ওকে তুই তোর কাছে নিয়ে যা, তোর কাজে লাগিয়ে দে,
তোকে তবু একটু-আধটু মানত একসময়ে।

ভিতরে ভিতরে এবারে একটু কৌতুক বোধ করেছিলাম।
···বেয়াদপি দেখে কোনসময় ছেলের কানে হাত দিলেও কাকীমার
সে-কি উগ্র ঝঙ্কার! আর বড়দির ঠাস-ঠাস কথা শোনানো। ওই
ছেলের তখন বছর নয়-দশ বয়েস। এতদিন পরে আজ কিনা
মান্যগণ্য করার প্রসঙ্গ।

—বাইরে বাইরে ঘুরে আমি কি কাজ করি তুমি জান ?

কাকার দ্বিধান্বিত মুখ। না···কি কাজ ?

—দালালী, এককথায় ভাঁওতাবাজী। ও নিজে চেষ্টা করলে
এ কাজ আমার থেকে ভালই পারবে।

প্রসঙ্গ-বিস্তারে ছেদ ঘটিয়ে নির্লিপ্ত মুখে উঠে চলে আসছিলাম।

—শীতল শোন্ শোন্। সঙ্গে সঙ্গে বড়দি পিছু নিয়েছে
—তোর জন্যে একটু চা করতে বলেছিলাম, ওপরে চল্—

ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়দির গোল মুখখানা চেয়ে দেখেছিলাম একবার।
তারপর সিঁড়ি ধরে তিনতলায় উঠে গেছি। পিছনে বড়দি। তিন-
তলায় পা দিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছি। —কি বলবে বল ?

—চা খাবি না ?

—না।

ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে বড়দি অনুযোগ করেছে, কি-রকম যেন
চাঁছাছোলা স্বভাব হয়ে উঠেছে তোর দিনকে দিন। ঘরে যাবি তো,
নাকি এখানেই দাঁড়িয়ে বলব!

—এখানেই বল, তাড়া আছে।

—খুব তাড়ার মানুষ হয়েছিস আজকাল, সত্যি একটু পরামর্শ করব বলেই ডেকেছি তোকে। ...আমারও হয়েছে এক জ্বালা, ওই ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে যখন-তখন বাড়িতে আড্ডা বসায়, ওর থেকে পাঁচ-সাত বছরের বড় এক-একটা ছোড়াও আসে, ওদের চাল-চলন একটুও ভাল লাগে না আমার—ঘরে এতবড় মেয়ে, রমুকে কতদিন বলেছি, ও কি কোন কথা কানে তোলে, উল্টে রেগে যায়।

বড়দির বড় আদরের একমাত্র ভাই রমু...ভাবছি দিনের চাকা কি ভাবে ঘোরে। বড়দির সমস্যা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, রমেনের ওই বন্ধুদের সঙ্গে মিমিরও ভাবসাব আছে নাকি?

মিমি তখনো হায়ার সেকেণ্ডারি পাড়ি দেয়নি। কিন্তু বাড়ন্ত গড়নের ফলে শাড়ি-টাড়ি পরলে তখনো একেবারে নাবালিকা মনে হত না।

বড়দি বিরক্ত। —কথাবার্তার কি যে ছিরি তোর, ও কি সেধে কারো সঙ্গে ভাব করতে গেছে, চায়ের জন্যে বার বার হাঁকাহাঁকি, কথা না শুনলে ভাগ্নির গায়ে এখনো হাত তোলে ওটা এমন বাঁদর। তুই ভাই বাবার জন্যে নাহোক আমার মুখ চেয়েও ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা, এরপরে নইলে এখানে টেকা দায় হবে।

কত সহজে এই বড়দিও আমার শরণাপন্ন হতে পারে ভাবলে অবাক লাগে। কোথা থেকে যে এরা আমার মধ্যে এতটা জোরের সন্ধান পাচ্ছে জানি না। দিনকাল যা, বড়দির ভাবনাটা যথার্থ সঙ্গত হতে পারে, আবার তার স্বভাবগুণে একটু অতিরঞ্জিতও হতে পারে। এ-সব ব্যাপারে বড়দির কল্পনা অনেক দূর গড়ায়।

কাকার তিন মেয়ে। বড়দি অমলা, মেজদি বিমলা, আর ছোট কমলা। তিন মেয়ের মধ্যে এক বড়দিই বয়েসকালে মোটামুটি সুশ্রী ছিল। মেজদির সাদামাটা চেহারা, আর রূপের আভিধানিক

বিশ্লেষণে কমলা কুৎসিত (আমার চোখে নয় অবশ্য)। তা সেই বয়সে হামেশাই ছেলেদের অনেক রকমের হ্যাংলামি চোখে পড়ত বড়দির। আর সেই সব হ্যাংলামি যে শুধুই তাকে ঘিরে, বড়দির তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। মেজবোন কমলার সঙ্গে সর্বদাই এ ব্যাপারে ঠারে-ঠোরে কথাবার্তা হত। ছোটবোন বিমলা আমার থেকেও দেড় মাসের ছোট, অতএব বড়দির মনের কথা শোনার মত তখন একমাত্র সঙ্গী মেজদি। বড়দির ধারণা আমি আর কমলা কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু আমি তো বুঝতামই, কমলা বোধহয় আমার থেকেও ভাল বুঝত। আড়ালে মুখ ভেঙচে বলত, রূপসী বসুমতী একেবারে, যে দেখছে সে-ই ভিরমি খাচ্ছে।

আমি ভয় দেখাতাম, বলে দেব।

—বল না দেখি কত সাহস তোর, গাঁট্টার চোটে তোর ভ্যাদ-ভেদে ফর্সা মুখ নীল করে দেব না।

দেড় মাসের বড় মানা দূরে থাক, বাগলে ওই গোছের হামলা সর্বদাই করে বসত।

যাক, আসলে বড়দি আমার থেকে ছ' বছরের মাত্র বড়। কমলারও তাই। বড়দির বিয়ের সময় আমাদের ষোল বছর বয়েস। বাসর জাগার কালে একঘর লোকের মধ্যে কমলা হঠাৎ ফর ফর করে নতুন জামাইকে বলে বসেছিল, দেখুন বড়দির চোখে ছেলেরা নাইনটি নাইন পারসেণ্ট হ্যাংলা—আপনি যেন মশাই বেশি হ্যাংলামো করবেন না। ভাল চান তো—বড়দি বেশি সাধাসাধি না করলে ফিরেও তাকাবেন না।

ছোটবোনের সাহস দেখে বড়দি বোধহয় সেদিন তাজ্জব বনে গেছল। মাত্র ছ' বছরের বড় হলেও বরাবর ছাব্বিশ বছরের বড়র মত দাপট তার।

তা ছোটশালীর উপদেশ ভদ্রলোক কতটা শুনেছিল বলা যায় না। পুরুষের কু-আবিষ্কার করার স্বভাব বড়দির দিনে দিনে বেড়েছিল বহু

মেনি। তার ভদ্রলোকটি আর যা-ই হোক কন্দর্পকান্তি নয় আদৌ। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বড়দি সন্দিগ্ধ চোখে দেখত তাকে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ির তিনতলার বাসিন্দা হবার পর ভদ্রলোক অব্যাহতি পেয়েছে। সেই সন্দেহ বাতিকটা এখন মেয়ের দিকে গড়াচ্ছে কিনা কে জানে।

বড়দির সন্দেহ রোগটা প্রায় গঞ্জনার আকার নিয়েছিল আমার বেলায়। তার মতে আমার একটাই সম্পদ--সেটা চেহারা। মুখে বলত মাকাল ফল, বলত মাখনের দলা। শুনেছি আমার মা রূপবতী ছিল আর সেই কারণে বাবার মনে একটু অশান্তিও ছিল। শেষের-টুকু কাকীমার বানানো গল্পও হতে পারে। বাবার চরিত্র নিয়েও বড়দি মনে মনে গবেষণা করত কিনা বলা যায় না। কারণ কাকার পরে বাবা বিয়ে করেছিল। কাশীতে বেড়াতে গিয়ে একেবারে রূপবতী বউ নিয়ে ঘরে ফিরেছিল নাকি। অথচ বাবা বিয়ে করবে না এমন পাকাপোক্ত ঘোষণার ফলে কাকার আগে বিয়ে হয়ে গেছল।

অতএব আমার স্বভাবচরিত্র নিয়ে বড়দির মাথা ঘামানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার ওপর পুরুষের রূপ জিনিসটা তার বিবেচনায় একটা আপত্তিকর বাড়তি বস্তু। ওর থেকে সুফল ছেড়ে কুফল বেশি বর্তায়। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, আর বড়জোর নাক মুখ চোখ টানটোন পরিষ্কার থাকবে—তার বেশি দরকার কি? ভবিষ্যতে আমি যে মেয়েঘটিত গোলযোগে পড়ব তাতেও বড়দির এতটুকু সন্দেহ ছিল না। গোলযোগের লক্ষণ সে আজ থেকে পনেরো বছর আগেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল। বাড়িতে অল্পবয়সী হলেও বড়দির থেকে খুব ছোট নয়। দ্বিতীয় সন্তান হবার পর বড়দি তখন বাপের বাড়িতেই আছে। একদিন ওই ঝিয়ের মুখে আমার রূপ আর গুণের প্রশংসা শুনে বড়দির কান বিষিয়ে গেল। ঝি ঠাকুরকে বলেছিল, কি সুন্দর চেহারা গো আমাদের দাদাবাবুর, আর কি মিষ্টি স্বভাব! দেখলে চোখ জুড়োয়—

মা-কে বলে সেই দিনই ঝি-কে বাড়ি থেকে বিদায় করেছিল বড়দি।

…তার রোগ কিছুটা ছাড়িয়েছিল কমলা। বিয়ের আগে পর্যন্ত ও যে আমার সঙ্গে হুটোপুটি মারামারি করত সেটা বড়দির বরাবরই চক্ষুশূল ছিল। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর থেকে কমলা আর তাকে একটুও পরোয়া করত না। তাকে সামনে পেলে আমার সঙ্গে আরো বেশি ফষ্টি-নষ্টি করত। তাই নিয়ে বড়দি কিছু বললেই তুলকালাম বেঁধে যেত। কখনো বলত, ডাক্তার ডেকে ভাল করে চোখ দেখাগে যা। কখনো বলত, তোর ছেলেটাকে সামলা, ও বড় মেয়েদের কোলঘেঁষা হয়েছে। এ-সব বিতর্ক অথবা রসালাপ অবশ্যই আমার সামনে হত না। তবু আমার কানে আসতই। আমার ব্যাপারে কমলার অনেক আচরণ বড়দির চোখে বাড়াবাড়ি। হলই বা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই-বোন, বয়েস কালে এমন হুটোপুটি নিজের ভাই-বোনেরাও করে না? হুটোপুটির সবটুকুই কমলা করত, অথচ বড়দির চোখে দোষটা আমার বেশি ছাড়া কম নয়। এক ক্লাসে পড়তাম আমরা, কিন্তু কলেজে ঢোকার পর দু'জন এক ঘরে বসে পড়াটা তার মনঃপুত হত না। একসময় প্রায়ই মাথা ধরত আমার, কিন্তু বড়দি সেটা ছল ভাবত। কারণ মাথা ধরেছে শুনলে কমলা আমার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকাত। খেতে বসে আমার থেকে কমলের পাতে বড় মাছখানা পড়লে কমলা সকলের সামনেই ফোঁস করে উঠত আর তাই দেখে বা শুনে কাকীমার থেকেও বড়দির মুখখানা বেশি গোমড়া হয়ে উঠত। বড়দি সে-সময় আভাসে ইঙ্গিতে তার মাকেও কিছু সতর্ক করে দিয়ে থাকবে। প্রায়ই দেখতাম কমলার সঙ্গে কাকীমার তুমুল ঝগড়া বেঁধে যেত। বচসার পর দুপদাপ করে ও একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। দোষের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি হল?

জবাবে রাগের চোখে কালো মুখ ভেঙচে ও তারস্বরে বলে উঠেছিল

ক আবার হবে, মেয়েমানুষের হদ্দ কোথাকারের—বাড়ি থেকে চলে যেতে পারিস না? আসুক বড়দি, ওকেও মজা দেখাচ্ছি আমি।

ঝাঁঝালো মজা বড়দিকে ও অনেকবার দেখিয়েছে। কিন্তু এক-বারের বোধহয় তুলনা নেই। মেজদি বিমলার স্বামীটি পাকাপোক্ত প্রবাসী। বেশ কিছুদিন অন্তে সেই মেজদি বাড়ি এসেছে। ফলে ই ক'টা দিন থাকবে বলে বড়দিও চলে এসেছে। এক দুপুরে দুই বোনে পা আলোচনা চলছিল কি। বাড়ির সর্বত্রই নিঃশব্দচরণে আনাগোনা আমার। কি জন্যে ওই ঘরেই ঢোকার দরকার হয়েছিল আজ আর নে নেই। বড়দির একটা অনুচ্চ মন্তব্য কানে আসতে দরজার এধারেই ড়িয়ে গেছলাম। চাপা সুরে হলেও বেশ জোরের সঙ্গেই বড়দি লছে, কালো কুৎসিত মেয়েদের তো ফর্সা সুন্দর ছেলের ওপর টান কেই, কিন্তু ওই সুন্দর ছেলেদেরও অনেকসময় দেখবি কালো-কুলো য়ের দিকে ঝোঁক—এরকম হয়, আমি গল্পের বইয়ে পড়েছি।

কমলার সঙ্গে আমার কোন আলোচনাতেই কোনরকম [illegible] ল না। ও বাড়ি ফিরতে কথাটা তার কানে তুলে দিলাম। স্তু শুনে এই কাণ্ড করবে ও ভাবতে পারিনি। সোজা বড়দির ছে উপস্থিত, বাধা দেবারও ফুরসৎ পেলাম না। দু'হাত কোমরে, রঙ্গিনী মূর্তি কমলার। —তোর মত মর্কট-মার্কা বড়দেরই শুধু ঝি রূপসী মেয়েদের ওপর ঝোঁক কেমন? একবার ছেড়ে দিয়ে খবি এই রূপ নিয়েই ঘায়েল করে দিতে পারি কি না?

বড়দি কান্নাকাটি করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছল, আর কাকীমা রপর দিনকতক আমার সঙ্গে কথাই বলেনি।

...পরে অনেক সময় ভেবেছি বড়দির মন্তব্যের মধ্যে কি সত্যের শমাত্র ছিল না? আমার মনের জগতে এ-যাবত একটি মাত্র য় স্বমহিমায় বহু বিচরণ করে গেছে—কালো কুৎসিত সেই মেয়ে, র নাম কমলা। ওর বিয়ে হয়ে যেতে আমার দুনিয়াটা অনেক-নি ফাঁকা হয়ে গেছল। এই চৌত্রিশ বছর বয়সেও এই চেহারার

প্রতি মেয়েদের অনেক রকমের উৎসুক চোখ দেখে অভ্যস্ত। তার মধ্যে কালো কুরূপা মেয়েদের দেখলে কমলার মুখ মনে পড়ে। রূপসী মেয়ে চোখ টানে কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতরটা কেমন উগ্রও হয়ে ওঠে। …দেব-দেবী নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি, তবু মাঝে-সাঝে কাকীমার পূজোর ঘরের কালীমূর্তিটি আমার চোখে ভাসে। তার গলায় মুণ্ডমালা হাতে অসি দেখেছি, আবার প্রসন্ন বরাভয় মুদ্রাও দেখেছি। কমলা আমার চোখে ওই দ্বিতীয় রূপে অদ্বিতীয়া।

…যাক, এতকাল বাদে সেই বড়দি আবার একই সমস্যায় জর্জরিত। নিজের মেয়ে তাই সংকট যেন আরো বেশি। তাকে বোঝাবার চেষ্টা নিবর্থক। সে চেষ্টাও করিনি। বলেছি রমেনকে সরানো আমার কর্ম নয়, ভয় ধরে থাকে তো মিমিকে বাইরে মেজদির কাছে পাঠিয়ে দাও।

প্রায় নিঃশব্দে গাড়িটা কাকার বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড় করালাম। দোতলায় ওঠার মুখে মনে হল কাকার সেরেস্তা ঘরে কেউ আছে। এ-সময়ে ঘর বন্ধ থাকার কথা, কিন্তু দরজা দুটো আধখানা ভেজানো। এগিয়ে এসে সে দুটো ঠেলে দেওয়া মাত্র নিজেই অপ্রস্তুত। কাকার চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে মিমি,। উল্টো দিকের চেয়ারে মুখোমুখি বসে বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলে। কি আলোচনায় মগ্ন ছিল দু'জনে জানি না, মিমির লালচে মুখ। একটা স্তব্ধ উত্তেজনা যেন ওই মুখে জমাট বেঁধে আছে।

—শেতল মামা! চেয়ার ছেড়ে মিমি ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠল। ছেলেটাও চমকে ফিরে তাকাল সেই সঙ্গে। এক নজর তাকিয়ে বেশ চৌকস আর শৌখিন মনে হল ছেলেটাকে।

মিমি হড়বড় করে বলে গেল, তুমি এসে গেছ, সকলে তোমার কথাই বলছিল, ছোটমাসিও এসেছে, ওপরে যাও।

এই দুটিকে এখানে দেখা মাত্র আমার বড়দির কথা মনে পড়ে

ছিল। তাই মিমির এই উক্তির তাৎপর্য তক্ষুনি মগজে ঢুকল না। উল্টে আমাকে তাড়াবার ফিকির ভাবলাম।

—যাচ্ছি, ইনি কে?

উত্তেজনার মুখেও মিমি থতমত খেল একপ্রস্থ। —সমরদা —সমর গাঙ্গুলী, মামুর খুব বন্ধু।

হাসব কি, কি-করব জানি না। ফিরলাম। ভাল দিন পড়েছে, মামুর খুব বন্ধুও ভাগ্নির দাদা হয় আজকাল। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিয়েই মনে হল, ও-ঘরে ঠিক মনের জগতের চাষ চলছিল না।··· সকলে আমার কথা বলছিল আর ছোটমাসি, মানে কমলাও এসেছে মানে কি? তবে কি অঘটনের খবর এরা পেয়েই গেছে নাকি?

দোতলাটা একেবারে নিঝুম স্তব্ধ যেন। সামনেই কাকার ঘর। এগোলাম। খাটের মাঝখানে কাকা স্থাণুর মত বসে। তার একদিকে দুই মেয়ে বড়দি আর কমলা। ও-ধারে কাকীমা উবুড় হয়ে পড়ে আছে।

···সকলেই খবর জানে তাহলে। আশ্চর্য, জেনেও সব ঘরে বসে আছে, কেউ হাসপাতালে যায়নি পর্যন্ত। কিন্তু জানল কি করে? খুব সম্ভব রমেনের সঙ্গীসাথীরাই খবর দিয়ে গেছে।

—আয়, কাকা বাইরে অন্তত ভেঙে পড়েনি, কমলা তোকে অনেকবার ফোন করেছিল···এ-দিকে তো সর্বনাশ হয়ে গেল।

বললাম, আমি এতক্ষণ হাসপাতালেই ছিলাম, সেখান থেকেই আসছি।

কাকীমা আলুথালু মূর্তিতে উঠে বসল। —হাসপাতাল থেকে এলি? কেমন আছে? আছে না গেছে বল্ না?

—আছে, ভালই আছে। সত্যের কতটা অপলাপ করলাম জানি না।

—সত্যি বলছিস? ওরা কেউ তাহলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? তুই নিয়ে যাবি?

জবাব দিলাম, এখন গিয়ে কোন লাভ হবে না, অত উতলা হযো না, ঝামেলার ব্যাপার বুঝতেই তো পারছ।

কাকীমা ডুকরে বলে উঠল, সবই বুঝতে পারছি—সেই তোর কাছে গেল, আগে যদি নিয়ে যেতিস তাহলে এ-রকম হত না রে, এ-রকম হত না।

এই খেদের মুখে কিছু বলা না বলা সমান। কাকা জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করা যাবে ?

বললাম, চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। চিকিৎসার যা দরকার ওরাই কবছে।

উঠে পড়লাম। কেউ বাধা দিল না, ভিতবে ভিতরে সকলেই বোধহয় নির্দয় ভাবছে আমাকে। কিন্তু মাথাটা সত্যিই বড় বেশি ঝিম ঝিম করছে এখন। এ পর্যন্তও উপোসই চলছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে বাধা পেলাম। চাপা গলায় কমলা ডাকল, শীতল শোন—

নেমে কাছে এসে দাঁড়াল। বিষণ্ণ উদ্‌গ্রীব মুখ। - এসেই চললি যে, সত্যি কেমন আছে ?

—ঠিক জানি না···ভাল মনে হল না।

—ডাক্তার কি বলল ?

—পুলিসের গুলীতে জখম হয়েছে, সেখানে ওর সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল না।

কমলা তেতে উঠল। তেমনি চাপা গলায় বলল, সুযোগ ছিল না নাকি ইচ্ছে করেই জিগেস করিস নি ?

খুব মিথ্যেও নয়। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। কালো মুখের কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ। আগের থেকে ঢের মোটা হয়েছে। তবু আগের মতই লাগছে আমার। কমলার ছেলেপুলে হয়নি, হবার আশাও নেই আর। তাহলেও দেখলেই বোঝা যায় বড়দির থেকে অনেক

সুখী ও। শুনেছি ওঙ্ক কর্তাটিকে ধরে এখনো ও ছোট মেয়ের আদরের খেলনার মতই নাড়াচাড়া করে—খাওয়ায় শোয়ায় ওঠায় বসায়। ওর রাগ দেখে আমার কোনদিন রাগ হয়নি, আজও হল না।

—গুলী কোথায় লেগেছে ?

—মাথার দিকে।

—সর্বনাশ! অস্ফুট আর্তনাদ। পরক্ষণে অসহিষ্ণু আবার। —তুই এখানকার কাউকে দেখতে পারিস না খুব জানি, তা বলে এ সময়েও দু'দণ্ড না বসে দুটো পরামর্শর কথা না বলে চলে যাচ্ছিস ?

ওর মুখের দিকে চেয়ে কয়েক পলক চুপ আমি। তারপর বললাম, মাথাটা বড় বেশি ঝিম ঝিম করছে, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি—

মুহূর্তের জন্য থমকালো। তারপর রাগ আর বিরক্তির অভিব্যক্তি। তারপর খপ করে আমার একটা হাত ধরে হিড় হিড় করে উপরে টেনে নিয়ে চলল আবার।

···পকেটমারের মার দেখার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে দুর্বোধ্য একটা হিসেবের গরমিল চলছিল আমার। হাসপাতালে ঢোকার পরে গরমিলের ফারাকটা আরো বেড়ে গেছল।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে হিসেব একেবারে মিলছে না, এমন নয়।

মণিদা, মণিলাল সেনশর্মা অসময়ে সশরীরে আমাকে দেখেও আনন্দে লাফিয়ে উঠল না। দবকার পড়লে অফিসে তাকে টেলিফোন কবি, তাইতেই ছুটতে ছুটতে সে-ই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কারণ, আমার ডাকার মানেই তার কিছু প্রাপ্তি-যোগ। রাত ন'টায় সেই আমাব তাব বাড়িতে অপ্রত্যাশিত পদার্পণ। অথচ মণিদা যেন জানতই আমি আসছি। আর এও জানে এই আসার সঙ্গে প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই।

মোট কথা, যে-বকম উদ্ভাসিত দেখব আশা করেছিলাম সে-রকমটা দেখা গেল না।

—এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—কি-বকম ?

কাঠের চেয়ারটা শয্যার সামানে টেনে দিল। —বসো।

একতলায় ছিমছাম দেড়খানা ঘবেব বাসিন্দা মণিদা। এ-ঘবটা বড়, পাশেরটা ছোট। ছোট ঘরটা খালিই পড়ে থাকে। সেখানে তাব রান্নার সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক হীটার, দু'চারখানা বাসন, চায়েব সরঞ্জাম আর ছোট একটা প্রেসার কুকার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বেশ রুচি আছে মণিদার, ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসে, তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ দিন নিজের রান্না নিজে করে। প্রেসার কুকারে সব একসঙ্গে চাপিয়ে দেয়, দশ মিনিটে কাজ শেষ। রুচি মাফিক এত রান্না করার সময় কোথায়। সকালে আপিস সন্ধ্যায় টিউশনি, তা ছাড়াও বাইরের পাঁচ রকমের কাজ। নেহাত ভাল না লাগলে

হোটেল থেকে খাবার আনায়। নিজের পয়সায় হোটেলের খাবার খেয়েও তৃপ্তি হয় না, কারণ পয়সার দিক থেকে ওরা গলা কাটে।

এ-সব গল্প মণিদাই করেছে। পয়সার এত মায়া কেন লোকটার বুঝি না, দশ বছর হল বউ মরেছে, আর, একটা তো মাত্র ছেলের দায়। তার সম্পর্কেও মণিদার স্পষ্ট ঘোষণা, লেখাপড়া খতম হলেই বাজারে চরতে ছেড়ে দেব, তার পরে বাবা আর কোন লেনদেনের কারবার নেই। নো গিভ্ অ্যাণ্ড টেক্ বিজনেস্—

চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সী-গোট-এর কাজ শেষ?

বউ মরে যাওয়ার পর থেকে মণিদা নিজেই নিজেকে হি-গোট সী-গোট আখ্যা দিয়েছে। চাকরি টিউশনি বা রোজগারের ধান্ধায় ঘোরে যখন, তখন হি-গোট, আর ঘর গেরস্থালি রান্নাবান্নার সময় সী-গোট।

—রান্না-টান্না আজ আর ভাল লাগল না, বাইরে খেয়ে নিয়েছি। কেন, তুমি খাবে কিছু?

রসিকতার পরিচিত মেজাজ দেখছি না ঠিক। —না। আমার কথাই ভাবছিলে কি রকম?

পা দুটো টেনে নিয়ে শয্যায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল। ভেঙে ভেঙে বলল, হ্যাঁ, সন্ধ্যার পর সুমু এসেছিল, এই সামনের তিন-চারটে বাড়ির পরেই থাকে ওরা—

বুঝেও জিজ্ঞাসা করলাম, সুমু কে?

—ওই যে সেই মেয়েটা, সুমনা দাশগুপ্ত—গঙ্গার ধারে তোমার গাড়িতে উঠে বসে বাস-স্টপে এসে নেমেছিল···হাসপাতালে আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুনলাম, তোমার নাম করল। ···ওর সঙ্গে তুমি আলাপের চেষ্টায় ছিলে আর লিফ্ট্ দিতে চেয়েছিলে নাকি?

মণিদার ভাবভঙ্গী সত্যি অন্যরকম লাগছে একটু। প্রথমেই এই কথাগুলো বিসদৃশ ঠেকছে কানে। সকালের সেই পরিবেশের কথা

বলতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। সে-চেষ্টা না করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম শুধু। দুটোই সত্যি। আলাপের চেষ্টায় ছিলাম আর লিফ্‌ট্‌ দিতেও চেয়েছিলাম।

এই জবাবও যেন মণিদার নীরব অস্বস্তির কারণ একটু। —কেন, সত্যিই তুমি ঘাবড়েছ নাকি?

—তোমার সুমনা দাশগুপ্ত বলল ঘাবড়েছি?

—না, তা ঠিক বলেনি, তবে ভয়ানক রাগ আর গোঁ তো, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়বে না এই ভাব আর কি। উল্টে আমিই বরং বলে দিয়েছি তুমি ঘাবড়াবার পাত্র নও। ··আচ্ছা, ওই যে ছেলে, রমেন ঘোষ না কি নাম—সে তোমার খুড়তুতো ভাই?

—হ্যাঁ।

—তোমার কাছেই থাকত?

—থাকত না, ইদানীং ছিল।

—কই, দেখিনি তো কোনদিন!

—তুমি অনেক দিন যাও নি।

—ইয়ে, কেমন ছেলে জেনেও বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলে?

বললাম, সে কৈফিয়ৎ পুলিসের কাছে দিয়েছি। কিন্তু তোমার কি ব্যাপার বল তো—আমার খুড়তুতো ভাই শত্রু তাই সুমনা দাশগুপ্ত আমাকেও শত্রু ভাবছে, কিন্তু তোমার হাবভাব এ-রকম কেন, তুমিও তাই ভাবছ নাকি?

মণিদা এবারে নড়েচড়ে সহজ হল একটু। —হ্যাঁ, আমার তো আর ঘটে কিছু নেই, ওই মেয়ের কথায় তোমাকে শত্রু ভাবতে যাব। ···আসলে কেমন ভেবাচাকা খেয়ে গেছি, বুঝলে, তোমাকে জড়িয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল, ওদিকে মেয়েটার আগুনে মূর্তি···

—শোকে ক্ষেপে গেছে?

—ক্ষেপে গেছে ঠিকই, তবে শোকের থেকে গোঁ বেশি। এক-একসময় মনে হয় মাথায় ছিট আছে মেয়েটার।

কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ছেলেটা মরে গেল সে ওই মেয়ের একমাত্র ভাই ?

এবারে হঠাৎ মুচকি হাসল মণিদা। —একমাত্র বটে আর ভাইও বটে···তবে তার মধ্যে ভেজাল আছে একটু।

আমি অবাক। —কি রকম ?

রোসো বলব'খন। অনেকখানি নিজের স্বভাবে ফিরেছে মণিদা। গম্ভীর রসিকতার সুরে জিজ্ঞাসা করল, ঘাবড়ে তো যাওনি নিজেই বললে, তবু ওই মেয়ের সঙ্গে আলাপের চেষ্টায় ছিলে আর লিফ্‌ট্‌ দিতে চেয়েছিলে কেন ? ···সৌজন্যের খাতিরে না আর কিছুর ?

না ভেবেই জবাব দিলাম, বোধহয় অন্য কিছুর। ···মেয়েটিকে আজ হঠাৎ কেমন ভাল লেগে গেছল।

—লেগে গেছল না, এখনো লেগে আছে, আর সেই জন্যেই এই গরীবের ঘরে এসে হাজির হয়েছ। ঠিক ?

—বোধহয় ঠিক।

মণিদা এবারে সত্যিকারের গম্ভীর। --আলাপ করতে আর লিফ্‌ট্‌ দিতে চেয়েছ শুনে আমারও এই রকমই সন্দেহ হয়েছিল। তোমাকে তো চিনি, ঝোঁক চাপলে সরাকে ধরা ভাবতে পারো (ধরাকে সরা নয়), কিন্তু গরীবের একটা উপদেশ শোন, ভাল লাগার শুরুতেই শেকড় কেটে দাও, ডালপালা গজাতে দিও না। ···ভাল লাগার জিনিস ভাল লেগেছে সেটা দোষের কিছু নয়, আর লোকের চোখে ভাল লাগানোর মত মেয়েটার ফরমূলাও কিছু জানা আছে, এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সময় সময় আমারই ধোঁকা লেগে যায় - যাক্‌ গে। ···ওই মেয়ের যখন চৌদ্দ বছর বয়েস তখন থেকে ওদের পরিবারের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমার। দাদা বলে ডাকলেও মেয়েটা কাকার মতই দেখে আমাকে, বাপটা হুট করে মরে যেতে দরকারে আমার পরামর্শের জন্যে ছুটে আসে—এতকাল ধরে দেখছি, মায়াও পড়ে গেছে সত্যি কথাই—তবু সত্যির দিক

থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়েই বা থাকি কি করে, বিশেষ করে তোমার মত আপনার জনদের যখন ভাল লাগতে শুরু করে।

ঘটা করে একটা শুকনো নিশ্বাস ছাড়ল মণিদা।

বক্তব্য স্পষ্ট, তবু ভিতরে ভিতরে একটু অস্বাভাবিক কৌতূহল আমার।—আপনার জনদের মধ্যে আমি কত নম্বর?

—এক নম্বর। ভাল লাগার জনদের পিছনে লাইন লাগালে বিশ-পঁচিশ হবে।···কোন রাস্তায় হাঁটা-চলা করে মেয়েটা জানই তো, রাতে গঙ্গার ধারের নিরিবিলিতে কার সঙ্গে কি-ভাবে বেড়াচ্ছিল নিজের চোখেই তো দেখেছ।

—তোমাকে দেখে তাকে ছেড়ে আমার গাড়িতে পালিয়ে এসেছিল কেন?

—লাভ-লোকসানের হিসেবে গোল বেঁধে গেছল বোধহয়। অত আর মাথা ঘামাতে পারি না বাপু, যা বোঝবার নিজেই বুঝে নাও। মায়ায় পড়ে আমার হয়েছে এক জ্বালা—

মণিলাল সেনশর্মার ঘর থেকে বেরিয়েছি আরো প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে। আমাকে খুব জেরা করতে হয়নি, লোকটি নিজে থেকেই গল-গল্প করে বহু কথা বলেছে। তারই থেকে কাট-ছাট দিয়ে যে চিত্রটা চোখে ভাসছে সেটা কতখানি দুঃখের বলতে পারব না। কিন্তু বড় জীবন্ত লাগছে আমার। জীবনের হাটে বসে কতজন কত রকমের মাশুল গুণে চলেছে ভাবলে অবাক লাগে।

···সুমনার বাবা ছোটখাট পুলিস অফিসার ছিল। তাই পুলিস দপ্তরের এখনো অনেকে চেনে ওকে। না চিনলেও বাপের পরিচয় পেলে খাতির করে। অফিসার ছোট হলেও ভদ্রলোকের পুলিসী দাপট বড় কম ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্বলচিত্ত ছিল মানুষটা।

স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রায়ই খিটির-মিটির বাধত কি নিয়ে। সুমনা তাদের একমাত্র মেয়ে, বয়েস কম, ঝগড়ার কারণটা সঠিক বুঝত না।

বেশি রেগে গেলে বাবা গর্জন করে উঠত, সুমনার মা তখন মুখ সেলাই করে বসে থাকত—কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলত ঠিকই। কারণে অকারণে তার আঁচ এসে লাগত সুমনার গায়ে। বাবা-মায়েতে যত ঝগড়াই হোক, মেয়েটা কিন্তু তার বাবাকে ভারী ভালবাসত। অত রাগী আর দাপটের বাপ মেয়ের গায়ে কোনদিন হাত তুলত না বা দোষ করলেও বকত না। মা মারধোর করলে বরং মায়ের সঙ্গে বাবার লেগে যেত।

…সেই বাবা হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ন'বছরের একটা ছেলেকে ঘরে এনে তুলল। বেশ মিষ্টি মিষ্টি দেখতে. নাম দীপু। কিন্তু ওই ছেলেটাকে নিয়েই বাবার সঙ্গে মায়ের কুরুক্ষেত্র বেধে গেল একেবারে। মা যা নয় তাই বলে বাবাকে গালাগাল করতে লাগল, ছেলেটাকে নিয়ে দূর হয়ে যেতে বলল। ওইটুকু ছেলেকে আনা হয়েছে বলে মায়ের অত রাগ দেখে সুমনা অবাক। বাবা যতক্ষণ সম্ভব মায়ের গঞ্জনা সহ্য করেছিল, তারপর অসহ্য হতে হঠাৎ উঠে একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে মায়ের দিকে তেড়ে গেল। মা চুপ। কিন্তু সেই থেকে এই অবধি কোনদিন ওই ছেলেটাকে তু'চক্ষে দেখতে পারেনি।

যাই হোক, হাওয়া একটু ঠাণ্ডা হতে ফাঁক বুঝে সুমনা ভয়ে ভয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, এই ছেলেটা কে বাবা?

—তোর ভাই। বাবা ভয়ানক গম্ভীর।

—ভাই! মেয়েটা অবাক, ভাই এল কোত্থেকে?

—এসেছে। বাবা হঠাৎ মেয়েকে কাছে টেনে নিয়েছিল। ওকে তুই ভালবাসতে পারবি না? ওর মা নেই…দেখছিস না কেমন মনমরা হয়ে আছে। ভাল বাসবি তো?

সুমনা দ্বিধায় পড়েছিল, যে ছেলের ওপর মায়ের এত রাগ তাকে ভালবাসতে গিয়ে কোন বিপাকে পড়বে কে জানে। তবু মাথা নেড়েছিল, ভালবাসবে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু ওর বাবা কোথায়?

বাবা আবার গম্ভীর।—এখন আমিই ওর বাবা।

চৌদ্দ বছরের মেয়ে, স্কুলে পড়ে, বাইরে বেরোয়, একেবারে অবুঝ নয়। হঠাৎ ধোঁকা লেগে গেছল বলেই গোড়ায় মাথা খেলেনি। মণিদার সেই সময় থেকেই ওদের বাড়িতে যাতায়াত। বাবার খাতিরে মাঝে-মাঝে ওকে এমনিতে পড়াতও একটু-আধটু। কিন্তু পড়ার থেকেও মেয়েব গল্পে মন বেশি। সুরসিক মণিদাও তার সমঝদার শ্রোতা ছিল। নতুন ভাইকে নিয়ে ওই সব ঝড়ঝাপটার কথা সে-ই মণিদাকে বলেছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে মেয়েটা নিজেই বুঝেছে সব। বুঝেছে দীপু এখন বাবার ছেলে নয়, বরাবরই বাবার ছেলে। সেই জন্যেই মায়েব অত রাগ। দীপুর মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কেরও গভীর জটিলতা কিছু ছিল তাও মেয়েটা আঁচ করতে পেরেছে।

বাবা মনে করত দীপু একটা শত্রুপুরীতে বাস করছে। তাই তাব লেখাপড়া খাওয়া-দাওয়া সবকিছুব দিকে কড়া নজর ছিল বাবার। ব্যবস্থার এতটুকু হেরফের হলে মাকে বকত। সেই থেকে বাপের বিরুদ্ধে ওব ভিতরে ভিতরে একটা অভিমান জমা হতে থাকল। সেটা প্রচণ্ড আকার নিল, ভাইয়ের জন্য বাবা পাকাপাকিভাবে মণিদাকে বহাল করার পর থেকে। ওকে অবশ্য বলেছিল, দরকার মত তুইও মণিবাবুর কাছ থেকে পড়াশুনা দেখে নিস। কিন্তু সেই থেকে সুমনা আর একটা দিনের জন্যও মণিদার কাছে পড়তে আসেনি---পরীক্ষার আগেও না। গল্প-টল্প মণিদার সঙ্গে আগের থেকে বরং বেশি করত, কিন্তু পড়াশুনার প্রসঙ্গ উঠলেই আর ধারে-কাছে ঘেঁষত না--এমন গোঁ মেয়ের।

এর দু'বছর বাদে আবার এক বিষম ওলট-পালট। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে সুমনা তখন সবে প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষাটা দিয়ে উঠেছে। বাবা একদিন বুকে বেদনা নিয়ে ফিরল, তার পরেই অজ্ঞান। যমে-মানুষে টানাটানি চলল দিন-কতক। তারপর আশা করা গেল যম হার মানল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভিতরে বোধহয় অন্যরকম ডাক

দিয়েছিল। একদিন বেলা তখন দুপুর, মেয়ের হাত ধরে অদ্ভুত অনুনয়ের সুরে বলল, আমি চলে গেলে দীপুকে তুই দেখবি—দেখবি না? বল না?

সুমনা কিছু বলে উঠতে পারছিল না। বাবা চলে যেতে পারে বিশ্বাস করেনি, তাই থমথমে মুখ।

কিন্তু বাবার আকুতিটা যেন একটা যন্ত্রণার মত গলা দিয়ে বেরিয়ে এল আবার।—চুপ করে আছিস কেন, দেখবি না? আমি চলে গেলে ওর আর কে থাকল?

—আমার কে থাকল?

প্রতিশ্রুতির বদলে প্রশ্ন শুনে বাবা হঠাৎ যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।—তোর মা আছে। তুই না আগলালে তোর মা হয়তো ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে, তুই ওকে দেখবি, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবি—করবি তো? আঃ, বল না, আমার যে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে—

সুমনা বলার সময় আর পেল না। বাবা হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে যেন বুকে হাত দিল, তার পরেই বিবর্ণ মুখ। শরীরটা বার কয়েক কুঁকড়ে গেল, দরদর ঘাম হতে লাগল, একবার হাত তুলে আঙুলের ইশারায় ওকে বিপদ বুঝিয়ে দিল।

সুমনা ভেবাচেকা খেয়ে গেছল প্রথম, তার পরেই ছুটে বেরিয়ে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার সঙ্গে করে ফিরল আবার। কিন্তু তার আগেই সব শেষ।

···সেই থেকে দীপুকে মানুষ করাব ঝোঁকটা একটা বিকৃতির মত পেয়ে বসল ওকে। এর সঙ্গে দুনিয়ার কোন কিছুর আপস নেই যেন। মণিদার ধারণা, ভাইকে ও একটুও ভালবাসত না, বাবার ব্যবহার আর পক্ষপাতিত্বের দরুন উল্টে বরাবর একটা আক্রোশই ছিল বরং। বাবার ওপর অভিমানের পাহাড় বুকের তলায়, দীপুকে মানুষ করতে পারাটাই ওর একমাত্র প্রতিশোধ। সেটা না-পারা পর্যন্ত ওই পাহাড় ধসবে না, পাথর গলবে না।

কিন্তু বাস্তবের পায়ে পায়ে সঙ্কল্প হোঁচট খেতে লাগল। প্রথম সমস্যা টাকা। বাবার পুঁজির মধ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু টাকা। অসময়ে মারা গেছে, সে-ও তেমন বড় অঙ্কের কিছু নয়। একটা লাইফ ইনসিওরেন্স পর্যন্ত ছিল না—তার কারণ বোধহয় ভদ্রলোককে অনেক দিন দু'দিকের খরচা সামাল দিতে হয়েছে। তার সম্বল, মৃতের পরিবারের বরাদ্দ কিছু মাসিক ভাতা। এই সম্বলের ওপর ভরসা করে সংসার চালিয়ে নিজে মানুষ হয়ে ভাইকে মানুষ করাটা হিসেবে আসে না।

কিন্তু ওর কাছে দীপুকে মানুষ করাটাই সব হিসেবের প্রথম কথা আর শেষ কথা। বড় ডাক্তার হবে দীপু, নয়তো বড় এঞ্জিনিয়ার। মায়ের রাগারাগি সত্ত্বেও আগের মতই মাস-মাইনে দিয়ে ওর জন্য মণিদাকে বহাল রাখল। সে-টাকার অনেকটাই অবশ্য মণিদা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওদের জন্যই খরচা করত।

মণিদারই কথা, এমন অসম্ভব গোঁ কোন মেয়ের সে আর দেখেনি। ওর মা পর্যন্ত মেয়ের কাছে হার মেনে হাল ছেড়েছে। প্রি. ইউ. পাস করার পর আর পড়া হয়নি। পড়ার মত টাকাও ছিল না, মনও ছিল না। দীপুকে মানুষ করার জন্য গচ্ছিত টাকায় হাত পড়ার সম্ভাবনা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

অগত্যা চাকরির চেষ্টায় নামতে হয়েছে। থার্ড ডিভিশনে প্রি. ইউ. পাস। উনিশ বছরের একটা সুশ্রী মেয়ের নিজের চেষ্টায় চাকরি যদি জোটেও, সেটাকে টিকিয়ে রাখা খুব সহজ হয় না। ওই বয়স থেকেই মেয়েটাকে অনেক জায়গায় অনেক রকমের কাজ করতে হয়েছে। লোকের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়ে পড়িয়েছে, প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে, মেয়ে ক্যানভাসার হয়েছে, মোটামুটি টাইপ শিখে দু'চার জায়গায় টাইপিস্টের চাকরি করেছে, কিছুদিন কোন ফিল্ম ডাইরেক্টরের পিছনেও ঘুরেছে। কিন্তু কোথাও বেশিদিন টিকে

থাকতে পারেনি। কোন কোন জায়গা থেকে হয়তো ছোটখাট ঘা খেয়েও সরে এসেছে, কিন্তু মণিদার বিশ্বাস, ওই অশান্ত মন নিয়ে এক জায়গায় বেশিদিন টিকে থাকা স্বভাব নয় মেয়েটারও। নইলে দিনে দিনে চোখ-কান ভালই খুলেছিল মেয়েটার, ছুনিয়ার হাল-চাল বুঝে নিজের চালচলন রপ্ত করে বার কয়েক মোটামুটি ভাল চাকরিও জুটিয়েছে। কিন্তু কিছুতে সন্তুষ্ট নয়, আরও ভালোর টোপ কেউ ফেললেই হিতাহিত না ভেবে সেটা গিলে বসে থাকে। ...তা টোপ ফেলাব লোকেরও তো অভাব নেই। এই করে কত বার পস্তাতে হয়েছে তবু স্বভাব গেল না। এই কিছুকাল আগেও একটা ভাল কাজ পেয়েছিল, বিলেত-ফেরত এক ডাক্তারের চেম্বারে অ্যাসিসট্যাণ্ট। কাজের মধ্যে রোগী রিসিভ করে পর পর ডাক্তারের চেম্বারের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে, তাদের কাছ থেকে হাত পেতে ফী নিয়ে তার হিসেব-পত্র রাখতে হবে, আর প্রত্যেক রোগীর নাম-ধাম লিখে একটা মোটা খাতায় প্রেসক্রিপশনের নকল রাখতে হবে। সকালে ছ' ঘণ্টা আর সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা, এই পাঁচ ঘণ্টার কাজ মাত্র—মাইনে চারশো টাকা, কাজে পাকাপোক্ত হলে সেটা আরো বাড়ত। ডাক্তারের এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সুপারি-শের জোরে কম্পাউণ্ডারি জানা জনাকয়েক মেয়েকে টপকে এই চাকরিটা জুটিয়েছিল। ব্যবসায়ী বন্ধুর সুপারিশটা কি করে আদায় হয়েছিল মণিদার জানা নেই। ...কিন্তু মোটমাট দেড় মাসও টিকে থাকতে পারল না। ছেড়ে-ছুড়ে চলে এল। মণিদা কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। সুমনা শুধু বলেছিল, ভাল লাগে না, একদিকে লাট-সাহেবের মেজাজ, অন্যদিকে অপদার্থ মানুষ।

শেষেরটা অর্থাৎ অপদার্থ মানুষ বলে চাকরি ছাড়ার কারণটা মণিদা বিশ্বাস করেনি। গণ্ডায় গণ্ডায় অমন অপদার্থ মানুষ না থাকলে ও এতদিন যাবত হালে পানি পেত না, শুকিয়ে অনেক আগেই ঝরে যেত। আসলে কোন কিছুতে সন্তুষ্ট নয় মেয়েটা,

টাকার সঙ্গে চটক চায় হয়তো, পুরুষের বে-চাল নিয়ে এখন আর ও-মেয়ে মাথা ঘামায় বলে মণিদা বিশ্বাস করে না।

…ডাক্তারের চাকরি ছেড়ে এখন এক ছোট ফার্মে মাত্র পৌনে দুশো টাকা মাইনেয় রিসেপশনিস্টের কাজ করছে। করবে কি, সর্বদা তো ভাল ভাল চাকরি হাঁ করে বসে নেই ওর জন্য। মেজাজও তাই অশান্ত এখন, এ চাকরি ছেড়ে আবার আর কিছু ধরার জন্য ছটফটানি।

স্থির শুধু ওই এক ব্যাপারে– দীপুকে মানুষ করার সংকল্পে। ও-ব্যাপারে কোনরকম সংশয়ের আভাস পেলেও ক্ষেপে যেত। আর ছেলেটাও ত্যাঁদড় হয়ে উঠছিল, সংশয় সর্বদাই দেখা যেত। হায়ার সেকেণ্ডারিতে আশাপ্রদ রেজাল্ট হল না বলে অতবড় ছেলেকে ধরে ঠাস-ঠাস করে চড়িয়েছে। ডাক্তারি বা এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে ঢোকার জন্য চেষ্টা না করে বি. এসসি. অনার্সে ভর্তি হল বলেও ক্ষেপে গেছল। শেষ পর্যন্ত মণিদাই ওকে ঠাণ্ডা করে, বুঝিয়ে বলে, এতেও ভাল রেজাল্ট করে অনেক বড় হওয়া সম্ভব। কিন্তু ছেলেটার চালচলনে সে আশায়ও ছাই পড়ছিল, নানা রকমের ছেলের সঙ্গে মেশামিশি করছিল। এই নিয়েও দুজনের খিটির-মিটির লেগেই ছিল, আর কলেজে ঢোকার পর থেকে ছেলেটা দিনে দিনে উদ্ধতও হয়ে উঠছিল। দিদির মুখে মুখে জবাব দিত, তেড়ে এলে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

প্রসঙ্গত মণিদা আর একটা খবর দিয়েছিল। আগে থাকতে বিপদের আঁচ ছেলেটা খুব ভাল করেই পেয়েছিল নিশ্চয়। কিছুদিন আগে থানায় গোটা কয়েক ছেলের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিল, বলেছিল, এরা ওকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়ে রেখেছে। আর থানার লোককে এও জানিয়েছে, কিছু ইতর লোক তার দিদিকে নিয়ে অশ্লীল আলোচনা শুরু করেছে, আর নানারকম ফিকির খুঁজছে অদূর ভবিষ্যতে দিদিরও সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনা আছে।

প্রথম অভিযোগে রাজনীতির গন্ধ, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। ওদের পরিচিত সেই পুলিস অফিসারটি দুটোকে মেলাতে পারেনি।

মণিদা লেখাপড়া-জানা মানুষ নয় শুধু, দস্তুরমত চালাক মানুষও। অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে তার খুব সুনাম, ব্যবহারিক জীবনেও তার মাথায় সর্বদা একটা অঙ্কের ছক ঘুরতে থাকে। সেই অনুযায়ী তার বাইরের চাল-চলন আচরণ। আমিও সেই অঙ্কের ছকের মধ্যেই পড়ি। এই অঙ্কের ফলাফলটা সর্বদাই নির্ভুল হয় বলেই আমার সঙ্গে তার আচরণও অনেকখানি নির্ভেজাল। তার একবারের দেওয়া কোন মক্কেলের সঙ্গে ভবিষ্যতে যতবার কাজ হোক, তাকে আমি ভুলি না। নিজে থেকে তার প্রাপ্যগণ্ডা তাকে দিয়ে আসি। অপ্রত্যাশিতভাবে থোকে থোকে অনেক টাকা অনেকবার মণিদা আমার কাছ থেকে পেয়েছে। না পেলে তার কিছু বলার ছিল না, কারণ একবারের চুক্তির জের কে আর বার বার টানে ?

তাই বেশ সুচারুভাবে মণিদা আমাকে একটু তোয়াজ করেই চলে। এ-ক্ষেত্রেও আমার শোনার আগ্রহ দেখেই তার বলার আগ্রহ। তার এই বলার আন্তরিকতায় আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু এই উপকারী অন্তরঙ্গ জনটিকে প্রকারান্তরে একটু সতর্ক করে দিতে গিয়ে দু'দিনের দেখা ওই মেয়েকে যে কতখানি আমার দিকে এগিয়ে দিল মণিদা, কল্পনাও করতে পারবে না। সুমনা দাশগুপ্ত মেয়ে, বাইরে থেকে তার সংগ্রামের চেহারাটা আলাদা হবেই! কিন্তু আমার সেই বিগত সংগ্রামের সঙ্গে যেন মূলে তফাত নেই খুব। ···জীবন আর মৃত্যু নামে দুই মলাটে বাঁধা বইয়ের থেকে আমার মতই সুমনা দাশগুপ্তর পাতাটাও খসে এসেছে—আমার মতই ওটা হাওয়ায় ভাসছে কখনো, কখনো বা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে। হ্যাঁ, মাত্র দুবারের দেখা ওই মেয়ের সঙ্গে অদ্ভুত একাত্মতা বোধ করছিলাম আমি। এমনও হয় আমার জানা ছিল না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ঘুরে-ফিরে কেবলই মনে হয়েছে, ও-রকম একটা মেয়ের প্রতীক্ষাতেই যেন

এতকাল বসেছিলাম আমি। এটা চৌতিরিশ বছরের এক উপোসী অস্তিত্বের জৈবিক ক্ষুধাও হতে পারে, তবু এই অদ্ভুত আকর্ষণের যেন আরো কিছু নাম আছে। আত্মযুদ্ধে নেমে সুমনা দাশগুপ্তর গায়ে ক'টা আঁচড় পড়েছে বা কতটুকু কালি লেগেছে সমস্ত রাতে আমি তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামাইনি। ওই একাত্মতা বোধটুকুই আমার রোমাঞ্চের কারণ, উত্তেজনারও।

···নিঃসংশয়ে জানি, সুমনা দাশগুপ্তর আত্মযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার সেই চৌদ্দ বছর বয়সে, বাবা যেদিন আত্মজ আর এক ছেলেকে ঘরে এনে তুলেছিল সেই দিন থেকে। আমার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এগারো বছর বয়সে—বাবা যেদিন অনেকটা ওই সুমনার বাবার মতই আচমক চোখ বুজেছিল। ···ঠিক বললাম না হয়তো, তারও অনেক আগে থেকে হঠাৎ হঠাৎ কি একটা অসহ্য শূন্যতার গ্রাসের মধ্যে আমি সেঁধিয়ে যেতাম আজও মনে আছে। আমার রূপসী মায়ের কোন অস্তিত্ব স্মরণে আসে না। তিন বছর বয়সের সময় সেই মা মাটির মায়া ছেড়ে গেছে। ···মনে আছে কাকীমা যদি কখনো আমাকে একটু আদর করত, বড়দি যদি কখনো দুটো আদরের কথা বলত— সেই দিনটা যেন আমার স্বপ্নের ঘোরে কাটত, কত যে ভরাট ভাবতাম নিজেকে ঠিক নেই।

বাবা মারা যাবার পরে প্রথম প্রথম আমার আদর-যত্ন মন্দ হত না। কিন্তু বছর না ঘুরতে সেই তাপ মিলিয়ে গেল। তার পর থেকে আমি যেন বাইরের একটা ফুল অন্য কারো সাজানো বাগানে শেকড় ঢুকিয়ে বসে আছি, আর বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে সেই মাটি থেকে রস টেনে চলেছি। রস পাচ্ছি না, আবার একেবারে ঝরেও যাচ্ছি না।

শুনেছি আমার মায়ের মাথায় ছিট ছিল একটু। আর সেই কারণেই নাকি অত রূপ সত্ত্বেও বেশি বয়সে বিয়ে। আমি অবিশ্বাস করি না। অল্পবয়েস থেকে খুব সুস্থ চিন্তার মধ্যে আমি বাস কি

নি। প্রায়ই মনে হত আমি যেন বাষ্পে ভরাট জীব একটা, এ-সংসারের মধ্যে আটকে আছি। হঠাৎ একদিন ভাসতে আরম্ভ করব, ভাসতে ভাসতে ওপরে উঠব—এরা সব হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখবে—কিন্তু এরা আর আমার নাগাল পাবে না—ভেসে ভেসে কোথায় চলে যাব ঠিক নেই—এদের সঙ্গে আমার কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিলও না, থাকবেও না।

কিন্তু গোল বাধত শুধু একজনকে নিয়ে। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বা থাকবে না ভাবতে পারতুম না। কমলার সঙ্গে। দেড় মাসের ছোট কুরূপা খুড়তুতো বোন কমলার সঙ্গে। বরাবর আমার চোখে ওর থেকে সুন্দর আর কেউ না। অনেক ঝগড়া অনেক মারামারি হয়েছে, সেই রাগের মুখে কেলে-কুচ্ছিত বলে নিজেই গাল পেড়েছি। কিন্তু আর সকলের মত ওকে কখনো মন থেকে বাতিল করে দিতে পারিনি।

…মাঝে মাঝে আমার হঠাৎ-হঠাৎ কান্না পেত কেমন। কাঁদতুম না, কিন্তু ক্বচিৎ কখনো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ত। সতেরো-আঠেরো বছর বয়সেও এ-রকম হয়েছে। কমলা দেখে ফেললে ধড়ফড় করে উঠত একেবারে। কাছে এসে কাঁধ ধরে ঝাঁকাত, চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকাত আর বলত, এ মা! কাঁদছিস কেন রে, অ্যা? এই শীতল! কাঁদছিস কেন?

ভয়ানক লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ওর শাড়ির আঁচলেই চোখ-মুখ মেজে নিতাম। এটা-সেটা বলতাম। ও বিশ্বাস করত না, জেরা করত। একবার বলেছিলাম, তুই আমাকে দাদা ডাকিস না কেন?

—তোকে দাদা ডাকব! দেব ধরে এক থাপ্পড়। বুড়ো ছেলে কাঁদলি কেন বল্ শিগ্‌গীর।

—আমি জানি না, আচ্ছা এক একদিন এ-রকম হয় কেন বল্ তো?

ও-ও বলতে পারেনি। কিন্তু বুকের ভিতরটা ওরও টন টন

করছিল টের পেয়েছিলাম। হাসতে চেষ্টা করে শুধু বলেছিল, তুই একটা রাম-বোকা।

···কিন্তু কেন ও-রকম হত আমি জানি। মাটির মানুষ শূন্যতায় ভরাট হয়ে সত্যিই উড়ে যেতে পারে না। সব রকমের অস্তিত্বের মধ্যে বাস করে এ শূন্যতার বিষম একটা যন্ত্রণা আছে।

এ-বাড়িতে আমি একটা বাড়তি মানুষ, অনাদরের মানুষ, সেটা সর্বদাই অনুভব করতাম। আমার খাওয়া-পরা আর পড়াশুনা চালিয়ে কাকা একটা অবাঞ্ছিত কর্তব্য পালন করছে। আমার কৃতজ্ঞতাবোধের অভাবে কাকীমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথা শোনায়, বড়দি ঠেস দেয়। বাইরে কখনো প্রতিবাদ করতাম না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সত্যিই বড় একরোখা আর অবাধ্য হয়ে উঠেছিলাম। সেই কারণে কাকা বিরক্ত, কাকীমা আর বড়দি সদা বিরূপ।

চরম ফয়সালা হয়ে গেল বি. এ-টা পাস করার পরে। আশা করেছিলাম কাকা এম. এ. আর ল' একসঙ্গে পড়তে বলবে। কিন্তু তার বদলে সামনে ডেকে কাকা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, দাদা দায়িত্ব চাপিয়ে গেছল বলে এ-যাবত অনেক করেছে, অনেক টেনেছে, আর সম্ভব নয়, এখন একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিয়ে নিজের দায়িত্ব নিজে নিলে সে অব্যাহতি পায়।

আমার ভিতরে কি হচ্ছিল সেটা মুখ দেখে বোঝা যায়নি নিশ্চয়। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানেই থাকব, না এখান থেকে চলে যাব ?

—যা খুশি। প্রশ্নটা ভাল লাগেনি কাকার। —যে-রকম মনের জোর থাকলে অনেকে ঘর ছেড়ে বড় হয়—সেই জোর তোর আছে ?

আমি কাকার মুখখানাই দেখছিলাম। তারপর বলেছিলাম, ঠিক আছে, আমি কি পাব দিয়ে দাও।

কাকা বিমূঢ় হঠাৎ। —তুই পাবি মানে?

—বাবা যা রেখে গেছল সব খরচা হয়ে গেছে? কিছু পাওনা নেই আমার?

যে করেই হোক সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি জানতাম, বাবা হাজার পনেরো টাকা রেখে গেছল। নাবালকের গার্জেন হিসেবে কাকা সেই টাকার জিম্মাদার ছিল। সুদে-আসলে এখন কত দাঁড়িয়েছে জানি না।

কাকা হকচকিয়ে গেছল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর চারখানা হয়ে ফেটে পড়েছিল একেবারে। —রাস্‌কেল! এতখানি জাহান্নমে গেছিস তুই! এতকাল ধরে এত করলাম আর আজ তুই পাওনা চাইতে এসেছিস! রাগের চোটে পায়ের এক পাটি চটি হাতে উঠেছিল। —হারামজাদা বেইমান কোথাকারের, পাওনা নিবি তুই? পাওনা চাই? চটি উঁচিয়ে মারতেই এসেছিল। —গেট আউট! বেরো—এই মুহূর্তে বেরো বলছি বাড়ি থেকে, নইলে ভাল করেই পাওনা বুঝিয়ে দেব তোকে আমি!

বেরিয়ে এসেছি।

পথে পথে ঘুরেছি। রাস্তার কলের জল খেয়ে দিন কাটিয়েছি। অজানা অচেনা লোকের বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে শুয়ে, পার্কের বেঞ্চিতে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। একদিন দুদিন নয়, এক রাত দু'রাত নয়, অনেক দিন অনেক রাত। মাতাল বা চরিত্রহীন ভেবে পুলিসও টানা-হেঁচড়া করেছে বার কয়েক। সেটা মায়ের কল্যাণে পাওয়া এই চেহারার দোষ—দেখলে সুখের ঘরের দুলাল ভাবে সকলে, প্রাণ-সংকটে ডুবু ডুবু-দুঃস্থ অন্তত ভাবে না কেউ।

কাজকর্মও কিছু কিছু করেছি—অন্তত করতে চেয়েছি। খবরের কাগজ বিক্রী করেছি, বুক-স্টলে কাজ নিয়ে বই বেচেছি, বড় স্টেশনারি শপে কাজ জুটিয়েছি, আপিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছি, ছেলে

পড়িয়েছি। যেখানে কাজ পেয়েছি সেখানেই রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছি। বেকার যখন, গাড়িবারান্দা বা মাঠের বেঞ্চ আছে।

…কোন কাজ থেকেই আমাকে অশোভনভাবে ছেঁটে দেয়নি। সর্বত্র আমি নিজেই সরে এসেছি। কারণ ভাল লাগেনি। ভাল না লাগার প্রধান কারণ অনাদর। দরদ নিয়ে কেউ বকা-ঝকা করলে আমার লাগত না, কিন্তু অনাদরের এতটুকু আঁচ লাগলে নিঃশব্দে ছেড়ে-ছুড়ে আবার নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

শেষের দিকে মাস দুই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মত একটু আশ্রয় জুটেছিল। এক বাড়িতে থেকে ছেলে পড়ানো আর তাকে সঙ্গ দেওয়ার কাজ। ওটা জোটানোর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে কপাল ঠুকে এক আপিসের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করে ফেলেছিলাম। জনাকতক লোক নেওয়া হবে জেনে এই চরম চেষ্টা।

সাক্ষাতের উদ্দেশ্য শুনে ভদ্রলোক গম্ভীর। অর্থাৎ বিরক্ত। আমি চলে গেলে বেয়ারাকে ডেকে ধমকাবে হয়তো। মরীয়া হয়ে চেয়ার টেনে সামনে বসে বলেছিলাম, একটা কাজ না পেলে আমার চলছেই না সার।

চেহারার কল্যাণে মুখের দিকে তাকালে কেউ ঘাড় ধাক্কা দেয় না। ভদ্রলোক জবাব দিল, সরি, ইউ হ্যাভ টু টেক ইওর চান্স, এভাবে দেখা করলে তার অ্যাপ্লিকেশন ক্যানসেলড্ হবার কথা—

—আমি অ্যাপ্লাই করিনি সার, কোন লাভ হয় না…

রাগত সুরে ভদ্রলোক বলে উঠল, তাহলে আর কি করার আছে, আটটা পোস্টের জন্য ছ'হাজার দরখাস্ত পড়েছে, তাদের বাতিল করে আপনাকে নেব ?

আমি বলে ফেললাম, তাহলে ওই ছ'হাজার দরখাস্ত খাম ছেঁড়া আর ছাটাই বাছাই করার কাজটা আমাকে দিন না সার—যে ক'দিন চলে

হাতের কলম ফেলে ভদ্রলোক সোজাসুজি মুখ তুলে তাকিয়েছিল এবার। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাস দেখেছিলাম কিনা বলতে পারব না।

—কি পাস ?

—আজ্ঞে বি. এ.।

ভদ্রলোক ব্যস্ত ছিল, বেশি কথা বলার অবকাশ ছিল না। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, সন্ধ্যার পর যেন এই ঠিকানায় দেখা করি।

পরের ইতিবৃত্ত বাদ দিলে সার কথা, সেই বাড়িতে থেকে ভদ্রলোকের এগারো বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর কাজে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম। থাকা খাওয়া জলখাবার সব ফ্রী, মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

আমার কাছে ঐশ্বর্যের সামিল। টিকে থাকলে এই ভদ্রলোকের কৃপায় তার আপিসেও একটা চাকরি ভবিষ্যতে জোটানো যেত হয়তো। কিন্তু কপালগুণে টিকে থাকা গেল না। ভদ্রলোকের স্ত্রীটির বছর তিরিশ-একতিরিশ বয়েস, আমার থেকে ঢের বড়। মহিলা প্রায়ই আমাকে অন্দর-মহলে ডেকে নিত, নির্দোষ গল্পগুজবই করত। এখানে আসার আগে পর্যন্ত কিভাবে কেটেছে শোনার পর থেকে আমার ওপরে একটু মায়াই পড়ে গেছল মনে হয়। তার ঘরের মানুষটি সেটা বরদাস্ত করতে পারল না, আমার ঘরে এসে একদিন বলে গেল, বাইরের মানুষকে বাইরের ঘরেই থাকতে হবে, যখন তখন অন্দর-মহলে যেন না ঢুকি।

ভদ্রলোক আপিসে বেরুবার এক ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রকে বলে আমিও ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি।

···পকেটে প্রথম মাসের মাইনের অবশিষ্ট কিছু ছিল। দ্বিতীয় মাসেরটা হাতে আসার আগেই চলে এসেছি। আবার পথ পকেটের টাকা ক'টা ফুরালে আবার সেই পেটের তাগিদ,

ভাগ্যে থাকলে আবার কিছু ধরা তারপর একদিন আবার সেটা ছাড়া।

নিজের ভিতর থেকেই কে যেন বলে উঠল, এই দেহ, এই অস্তিত্ব যে এভাবে টানতেই হবে তার কি মানে ? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? এবারে ঘুমিয়ে পড়লেই তো হয়। আর না জাগলেই তো হয়।

চিন্তাটা একটা লোভের মত সমস্ত দিন মাথায় চেপে বসে থাকল। শেষে মন স্থির। বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল। কতটা লাগে জানি না, বেশ বড় একডেলা আফিম সংগ্রহ করলাম। পকেটে পয়সা থাকলে সব মেলে। এর থেকে ভাল আর কিছু আমার মাথায় আসেনি। সন্ধ্যায় ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করলাম। একটু বেশি রাতে ভাঁড়ে খানিকটা খাবার জল নিয়ে পার্কের এক কোণের অন্ধকার বেঞ্চে আশ্রয় নিলাম। মন বেশ প্রসন্ন। একটা চাপা কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ভিতর থেকে।

পৃথিবী, তোমাকে নমস্কার।

নমস্কারটা সে নেয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে।

ক'দিন বাদে বলতে পারব না, চোখ মেলে দেখি হাসপাতালের একটা মাঝারি সাইজের ঘরে শুয়ে আমি। সামনে কাকা কাকীমা কমলা।...অর্থাৎ কমলার শ্বশুরবাড়িতেও খবর গেছে এবং খবর পেয়ে ও ছুটে এসেছে...কিন্তু এরা জানল কি করে ? খবর পেল কি করে ?

আমার পকেটে পুরনো কালের একটা ছোট মোটাসোটা নোটবই থাকত। দু'চারটে খেয়ালের কথা ছাড়া ওতে কাজের কথা বিশেষ থাকত না। ওটার গোড়ায় বাড়ির অর্থাৎ কাকার বাড়ির ঠিকানাপত্র লেখা ছিল। মনে হয় ওটার থেকেই হদিস মিলেছে।

ঘরের চার কোণে চারটে মাত্র বেড। অর্থাৎ একটু দামী জায়গাতেই রাখা হয়েছে আমাকে।...এই ব্যবস্থা বোধহয় কমলার।

তার স্বামীর ভাল ব্যবসা আছে। পরে জেনেছি ব্যবস্থা কমলার হলেও খরচপত্র সব কাকাই করেছে। ...বিকেলে খানিক্ষণের জন্য একলা পেয়েছিলাম কমলাকে। ওর থমথমে মুখ। কিন্তু আমার বেশ মজা লাগছিল ওকে দেখতে।

ও জিজ্ঞাসা করল, এ-কাজ করতে গেলি কেন?

আমি বললাম, তুই ছিলি না কেন?

রাগতে গিয়েও রাগতে পারল না। কিন্তু ঝাঁঝালো সুরেই বলল, তুই একটা আস্ত বোকা, আছি কি নেই দেখছিস না?

আমি দ্বিজ। দুবার জন্মেছি। তার জন্য কোন আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্কারের দরকার হয়নি। একডেলা আফিম শুধু লেগেছিল।

.. দ্বিতীয় জন্মে এই হাসপাতাল থেকেই আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরেছিল। এক বৃত্ত থেকে অতি সহজে আর এক বৃত্তে পৌছে গেছি।

আমার পাশের কোণের বেডে এক ভদ্রলোক অ্যাপেনডিক্স অপারেশনে এসেছিল। নাম কাজল বোস। কালো মোটাসোটা বড় কাঠামোর হাসিখুশি মানুষ, না হাসলেও দুচোখ সর্বদা হাসছে মনে হয়। আলাপে পাঁচ মিনিটে পাঁচ দিনের ব্যবধান পার হতে জানে লোকটি।

কিছুটা আলাপ হতে কাজল বোস হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল, আত্মহত্যা করতে গেছলে কেন হে, প্রণয়-ঘটিত নাকি?

বয়সে আমার থেকে আট-দশ বছরের বড়। দ্বিতীয় দিনেই 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলা শুরু করেছিল। একই সুরে জবাব দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, পৈটিক প্রণয়।

সকৌতুকে একটু চেয়ে থেকে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করল. খারাপ রোগটোগ কিছু নাকি?

—খুব খারাপ। সকালে দুপুরে বিকেলে রাত্তিরে কেবল খাই খাই, তাই জন্মের খাওয়া খাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক অল্প অল্প হাসতে লাগল। রসিকতা ভাল লেগেছে মনে হয়। জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এরা সব কারা তাহলে, যত্ন-আত্তি খরচাপত্র করে তোমার চিকিৎসা করছেন ?

—এ-দেশে মরলে পরে চিতায় মঠ দেয়, আমি তার আগেই পাচ্ছি।

পথের সন্ধান এই লোকের কাছ থেকেই আসবে কে জানত। হৃষ্টমুখে কাজল বোস মন্তব্য করল, বুদ্ধি-সুদ্ধিও তো বেশ···তাহলে এ-কাণ্ড করতে গেলে কেন ? তোমার মত চেহারা থাকলে আমি মেয়ে ভুলিয়েই নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম।

মণিলাল সেনশর্মার সঙ্গে এখানেই আলাপ প্রথম, পরে হৃদ্যতা। কাজল বোসের বন্ধু সে। প্রায়ই হাসপাতালে আসত তাকে দেখতে। আমার তখনই মনে হয়েছিল মণিদার দিক থেকে অন্তত বন্ধুত্বটা স্বার্থের সূতোয় বাঁধা।

হাসপাতাল ছেড়ে যাবার আগে কাজল বোস একখানা কার্ড রেখে গেল। বলে গেল, দেখা কোরো, তোমাকে কাজে লাগাতে পারি কি না দেখি—

কাজে লাগিয়েছিল।

কারো কারো পক্ষে টাকা রোজগার করা যে এত সহজ নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না। অভিজাত মহলের যাবতীয় সমস্যার মুশকিল-আসান যেন কাজল বোস। কে মস্ত মস্ত জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর বেচবে আর কে কিনবে, সংগোপনে কোন্ রাজা-মহারাজা সদৃশের বংশধর পূর্বপুরুষের সোনা-দানা হীরে-জহরত দুর্লভ দামী আসবাবপত্র অথবা অমূল্য পাঠাগার কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে হাতছাড়া করবে আর কে সে-সব হাতে নেবে, কোন্ অভিজাত-নন্দনের লাখ দু'লাখ টাকা দরকার হয়ে পড়ল হঠাৎ আর লাভ সহ উপযুক্ত বন্ধকীর নিরাপত্তা পেলে কোন্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অথবা পরিচিত বিত্তবান্ অনায়াসে সেই টাকা বার করে দেবে—সর্ব ব্যাপারে এই দু'পর্যায়ের

মানুষ যেন কাজল বোসের হাতের মুঠোয় মজুত। এ ছাড়া বহু বড় বড় পার্টি আর সামাজিক অনুষ্ঠানেও কর্ণধার দেখতাম কাজল বোস। বড় বড় যে সব হোটেল রেস্তোরাঁ দূর থেকে দেখেছি, এই লোকের দৌলতে দু'তিন মাসের মধ্যে আমার সেখানে অবাধ যতায়াত। সে-সব জায়গায় অতি পদস্থ কর্মকর্তারাও আমাকে দেখলে হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলায়। সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গেও এরই মারফত অন্তরঙ্গ যোগ। এই পর্যায়ের ভদ্রমহোদয় আর মহোদয়াদের টাকার ওজনের থেকে মনের ওজন ভারী। কাজল বোস যেন তাদের আরো বেশি আপনার জন। মানের কদর যেমন করে থাকে, প্রয়োজনে তাদের মান বাঁচাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত।

...যোগ্য সহকারী হিসেবে এই ভদ্রলোকের পাশে থেকে তিন বছর কাটিয়ে দিয়েছি। বরাদ্দ মাইনে কিছু ছিল না। গড়পড়তা মাসে পাঁচ-ছশো টাকার মত আমাকে দিত। সপ্তাহে তিন-চার দিন খাওয়া-খরচাও তার অথবা তার পার্টির ঘাড়ের ওপর দিয়েই যেত। তবু এমনই সংশ্রব যে তখন পর্যন্ত বছরে দু'হাজার অর্থাৎ তিন বছরে ছ'হাজার টাকার বেশি ব্যাঙ্কে পাঠাতে পারেনি। কাজল বোসের উপদেশ, যেখানে যাবে, তার কাছাকাছি গিয়ে অন্তত একটা চকচকে ট্যাক্সি নেবে। কিন্তু ভাগের বাহন পোষাত না, যাতায়াত সবটাই ট্যাক্সিতে মেরে দিতাম। টাকা এই খাতেই বেশি খরচ হয়ে যেত।

...তিন বছর বাদে রাতারাতি একদিন কলকাতা থেকেই উবে গেল যেন কাজল বোস। তার আগের দিন আমাকে বলল, সাড়ে সাত হাজার টাকায় গাড়িটা একজনকে দিয়ে দিচ্ছি...আজকের মধ্যেই আমার ও টাকাটা দরকার তাই, তাছাড়া দুই একদিনের মধ্যেই আমার নতুন গাড়ি এসে যাচ্ছে—তুমি নেবে তো দেখো, হাতে সময় থাকলে কম করে বারো হাজার টাকা দাম পেতাম—

আমি অবাক যেমন উত্তেজিতও তেমনি। অবাক কারণ, ভদ্র-

লোকের সাড়ে সাত হাজার টাকা নিজের দরকারে সংগ্রহ হল না এ যেন অবিশ্বাস্য। আর উত্তেজিত কারণ, মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকায় অমন গাড়ি হাতে আসতে পারে বলে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আমার মাত্র ছ'হাজার টাকা আছে।

—এক পয়সাও কম নয়। বিকেলের মধ্যে বাকি দেড় হাজার টাকা নিয়ে এসো—দেখা যাক, তিন বছর কি-রকম সাগরেদি করলে।

বিকেল নয়, পরের দু'ঘণ্টার মধ্যেই, বাকি দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিলাম। ·কাজল বোসেরই একজন সুপরিচিত মহিলার কাছ থেকে সেই টাকা এনেছিলাম। নাম মিসেস খান্না। বছর তিরিশের কম নয় বয়স, রমণীটি আমাকে একটু বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখত ইদানীং, যার ফলে ভিতরে ভিতরে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতাম। সোজা ত' কাছেই হাজির আমি। দেড় হাজার টাকা চাই এবং কেন চাই শুনে ছদ্ম গাম্ভার্যে মুখখানা ভরাট করে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাকে টাকা দিতে যাব কেন, আর দিলেই বা কি শর্তে দেব ?

আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, শর্ত পরে হবে, আগে টাকাটা বার করুন তো, জল্‌দি—স্ট্যাম্প আমার কাছেই আছে, লিখে দিচ্ছি।

মুখের দিকে চেয়ে মহিলা মিটিমিটি হেসেছিল, তাই দেখে আমার গায়ের রক্ত সির সির করে উঠেছিল কেমন।

মহিলা দেড় হাজার টাকা এনে দিয়েছিল। বলেছিল, লিখতে হবে না, নিয়ে যাও।

টাকা পেয়ে কাজল বোস পিঠ চাপড়ে তারিফ করেছিল, করে খেতে পারবে দেখছি।

পরদিন থেকে আর কাজল বোসের দেখা পাইনি। দিনকতক বাদে বুঝেছি আর পাবও না কোনকালে। ···কাগজে একটা বড় দরের চোরাই চালানের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। আসামীদের একজনেরও হদিস মেলেনি। কিন্তু কি এক অহেতুক ত্রাসে বেশ কিছুদিন

কণ্টকিত হয়েছিলাম আমি। আর কিছু না হোক. আসামীর অনুগত সহচর হওয়াটাও কি অপরাধ নয়?

…আমার গায়ে কারো সন্দেহের আঁচড়ও পড়তে দেয়নি এক মহিলা। যৌবন বাস্তবের প্রথম অবাঞ্ছিত রমণী।

…মিসেস খান্না।

মণিদা বলে, টাকার সঙ্গে চটক চায় সুমনা দাশগুপ্ত, তাই এত অস্থির। চাইতে পারে, কিন্তু অস্থিরতার সেটা মূল কারণ আদৌ মনে হয় না। টাকা তো আমিও চাই, দিনযাপনের বর্ণবৈচিত্র্য আমারও খারাপ লাগে না। টাকা পাচ্ছি, অন্তত যা আশা করেছিলাম তার থেকে ঢের বেশি পাচ্ছি, আর তাব কল্যাণে কিছুটা চটকের মধ্যে গা-ভাসানো কঠিন কিছু নয়। তবু ভিতরটা এত অস্থির কেন? মাঝে মাঝে পায়ের নীচে মাটি নেই মনে হয় কেন?

টাকা রোজগারের সহজ রাস্তা সুমনা দাশগুপ্তও কিছুটা চিনেছে। আর সেই রাস্তায় চটকের রসদ আপনা থেকেই ছড়ানো। তবু বার বার এগিয়েও ফিরে ফিরে আসে কেন? মণিদার ভাষায় পুরুষের বে-চাল নিয়ে যে মেয়ে আর মাথা ঘামায় না, শুধু টাকা আর চটক চাইলে সেই মেয়ে গঙ্গার ধারের প্রণয়ীকে ছেড়ে আসে কেন? পুরুষের বে-চালের সুযোগে ভালো ভালো কাজ জুটিয়েও টিকে থাকতে পারে না কেন? ফিল্ম্-ডাইরেক্টরের নাগাল পেয়েও হাল ছেড়ে আবার নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন?

…আরো একটা কথা, শুধু টাকা আর চটক যার লক্ষ্য, বাপের ওপর অভিমান পুষে একটা অবাঞ্ছিত ছেলেকে মানুষ করার ব্যাপারে দশ বছরের মধ্যেও সেই মেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, এমন নজির বিরল।

আমার বদ্ধ ধারণা, সুমনা দাশগুপ্ত এত চঞ্চল এত অস্থির এত অসহিষ্ণু কারণ তার অন্তরাত্মা আরো কিছু চায় যা সে জানে না। সেই চাওয়ার সঙ্গে নিজের অজ্ঞাত চাহিদার প্রচণ্ড মিল—কিন্তু কি সেটা ধরতে পারছি না।

সকাল সাড়ে-ন'টায় থানায় হাজিরা দেবার কথা। ঘড়ি ধরে সকাল ন'টায় কমলা এলো। আসবে বলেছিল। রমেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পুলিসের অনুমতি দরকার কিনা জানা নেই, অতএব আমার সঙ্গে সে-ও থানায় যাবে বলেছিল।

একটু ইতস্তত করে কমলা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা শীতু, ওই যে ছেলেটা মারা গেছে·· তার বড় বোন-টোন আছে ?

---আছে···কেন ?

—মিমি কি সব বলছিল, তুই যেন ঘুণাক্ষরেও কারো নাম করিস না, মিমি তোকেও বলতে বারণ করেছিল···

—মিমি কি বলেছে ?

—বলছিল, রমু নাকি ওই খুন-খারাপীর মধ্যে ছিল না, যে-ছেলেটা মারা গেছে সে একসময় ওর বন্ধু ছিল, একসঙ্গে পড়ত। ছেলেটা ভিন্ন দলে চলে গেছল বলেই ওর সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ছিল। ···আসলে যত গণ্ডগোল নাকি ওই বড়বোনকে নিয়ে, কারা নাকি খারাপ মতলব নিয়ে ঘুর ঘুর করত, তার ভাই তাদের এই নিয়ে একদিন খুব অপমান করতে তারা শাসিয়ে গেছল, দিদির অদৃষ্টে যা আছে তা তো হবেই, তার আগে ওই ভাইকে একেবারে শেষ করবে। ···মিমির ধারণা, সেই দিনই বিপদ টের পেয়ে রমু খুব সম্ভব ছেলেটাকে সাবধান করতে ছুটেছিল···তার আগেই যা হবার হয়ে গেল, মাঝখান থেকে পুলিসের গুলীতে রমুটা···

কমলা আর বলতে পারল না। তথ্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে কিনা বুঝছি না। মিমি এত খবর রাখে কি করে সেটা অবশ্য আঁচ

া শক্ত নয়। ওর অমরদাকে তো স্বচক্ষেই দেখেছি, আরো ক'টা
া আছে কে জানে। বড়দির তো সেই কবে থেকেই ত্রাস।

থানা-অফিসার ভদ্রলোক আজও গম্ভীর বটে, কিন্তু গতকালের মেজাজ অত রুক্ষ নয়। মনে হয় কাল যে নামগুলো দিয়েছিলাম দের দুই-একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কমলাকে একনজর খ নিয়ে বলল, বসুন।

অফিসারের ডানদিকের চেয়ারে সুমনা দাশগুপ্ত বসে। এখানে র দেখা মিলতে পারে এ-রকম আশা মনে মনে ছিল। আজ পরনে ক সবুজ বুটে শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। আটপৌরে ধরনের এই বাসে আজও ভালই লাগল। মুহূর্তের মধ্যে আরো একটা মিল খে পড়ল। আমি উপোস করে থাকলেও লোকে বিশ্বাস করত সুখের ঘরের দুলাল ভাবত। এই মেয়েকে দেখলেও কেউ নযুদ্ধে অস্থির এবং ক্ষতবিক্ষত ভাববে না। সুখের ঘরের শীলা মেয়েই মনে হবে।

কিন্তু মুখখানা গত দিনের মতই ঠাণ্ডা কঠিন। আমাদের দিকে ক্ষপ না করে আগের কোন কথার জের ধরে অফিসারকে বলল, র নাম করে ইনটেলিজেন্সের একজন অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনারের আমি দেখা করেছিলাম, তিনিও আপনার মত কথা দিয়েছেন, মধ্যে যারা আছে তাদের সকলকে টেনে বার করা হবে, কেউ ই পাবে না।

আমার মনে হল কথাগুলো যেন আমাদের জন্যই বলা। সার সায় দিল, চেষ্টা করা হবে বলেছি তো, যে-ক'টা নাম আমার হ আছে আপাতত তারা সকলেই ফেরার।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ঘুরতে কমলার পরিচয় দিয়ে জানালাম কে দেখতে চান, আপনাদের অনুমতির জন্য এসেছেন।

—সিওর। হাসপাতালে আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

ভিজিটিং আওয়ার্সের বাইরেও যে-কেউ ওই পেসেন্টকে দেখতে যে
পারবে।

···অর্থাৎ কারা দেখতে আসে না আসে তাদের ওপরেও ক
নজর রাখার ব্যবস্থা আছে। ভিজিটিং আওয়ার্সের পরে দলের কে
যদি চুপি চুপি এসে দেখা করতে চায় সেই সম্ভাবনার কথা চি
করে এই নির্দেশ সম্ভবত।

কমলা জিজ্ঞাসা করল, রমেন ভালো আছে তো?

কঠিন চোখে সুমনা দাশগুপ্ত তার দিকে তাকালো।

বিচিত্র পরিস্থিতি বটে। একজন তার ভাইয়ের জন্য উতল
আর একজন সেই কারণেই অসহিষ্ণু।

অফিসার গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ভালো না। —আ
···আপনার ভাইয়ের কাছে যারা আসত, আপনি তাদের নাম জা
বা চেনেন?

নীরস সুরে কমলা জবাব দিল, এক বছরের মধ্যে ভাইয়ের স
আমার বিশেষ দেখা-টেখা হয়নি।

কি মনে হতে আমি নড়ে-চড়ে বসলাম। টেবিলের উল্টো
সোজা সুমনা দাশগুপ্তর দিকে তাকালাম। —আমাদের ভাই, ম
রমেন ঘোষকে আপনি আগে চিনতেন?

জবাব পেলাম না, চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল শুধু। আ
বললাম, আমার খবর, রমেনের সঙ্গে আপনার ভাই দীপুর অ
পরিচয় ছিল, আমি জিগেস করছি, আপনার বাড়িতে রমে
কখনো দেখেছেন?

মৃদু কঠিন সুরে জবাব দিল, অনেক আগে।

সামনের দিকে তাকালাম এবার, এখন আর মুখ দিয়ে সার
বেরুলো না—আচ্ছা অফিসার, শুনেছি বিপদ ঘটাতে পারে এমন
কতকের নাম দীপু দাশগুপ্ত আপনাদের আগেই দিয়ে রেখে
তাদের মধ্যে রমেন ঘোষের নাম আছে?

থানা-অফিসার থমকালো একটু। —নেই···নামের লিস্টের
র জানলেন কি করে?

প্রশ্নে কান না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আর, কিছু বাজে
ক মিস দাশগুপ্তর সম্ভ্রমহানির মতলবে আছে এমন কিছু নামও
পনারা পেয়েছিলেন—সেই লিস্টে রমেন ঘোষের নাম আছে?

আবারও মাথা নাড়ল। নেই। সন্দিগ্ধ চাউনি। —কিন্তু
পনাকে যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দিন, এ-সব খবর আপনি পেলেন
করে?

সুমনা দাশগুপ্তর কঠিন মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে। সে-ও
অবাক হয়েই আমার জেরা শুনছিল। তাকে দেখিয়ে বললাম,
ই এক আত্মীয়তুল্য ভদ্রলোকের মুখে। নাম মণিলাল সেনশর্মা,
পু দাশগুপ্ত তার অনেককালের ছাত্র, মনে হয়, ঘাবড়ে গিয়ে সে-ই
কে এ-সব জানিয়েছে।

নামের তালিকা সম্বন্ধে দীপু তার দিদিকে যে কিছু বলেনি সেটা
র মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তখনো আমার
কেই চেয়ে আছে সে।

নীরস সুরে থানা-অফিসার জিজ্ঞাসা করল, যাক, আপনি কি
তে চাইছেন?

নির্দ্বিধায় এবারে মিথ্যার আশ্রয় নিলাম একটু। বললাম,
রিচিত কারো বিপদের সম্ভবনায় রমেনকে ক'দিন উতলা দেখে-
লাম, কোন মহিলার বিপদের আভাসও পেয়েছিলাম···এখন বুঝছি
দের জন্যেই। আমার বিশ্বাস, রমেন ঘোষ এঁদের সতর্ক করার
ন্যই ছুটেছিল, কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে···আর
নাস্থলে পুলিস ওকে দেখে গুলী করে দিয়েছে।

থানা-অফিসারের সন্দিগ্ধ চাউনি ঘোরালো হয়ে উঠল। রুষ্ট
স্বরে বলল, কেন কি করেছে সেটা পুলিস ভালই জানে, আপনার
ই কোন দলের ছেলে জানত বলেই পুলিস তাকে খুঁজছিল···

বাড়িঘর ছেড়ে সে কি হাওয়া খাওয়ার জন্যে আপনার কা
লুকিয়ে ছিল ?

ধীরে-সুস্থে জবাবটা দিয়ে ফেলে ভিতরে ভিতরে একটু শা
আমি। থলথলে ভারী মুখের রং বদলাচ্ছে, এক্ষুনি না ধৈর্যের মুখে
খসে পুলিসী মেজাজ বেরিয়ে পড়ে। বলেছি, খুঁজছিল বলেই দে
পেলে পুলিস তাকে গুলী করতে পারে কিনা সেটা ওর বাবা বুঝ
তিনি নামী উকিল···আমার যা খবর সেটুকুই আপনাকে জানি
রাখলাম।

বরাত ভাল, টেলিফোন বেজে উঠল। ও-দিকের কি কথায় স
দিয়ে অফিসার রিসিভার নামিয়ে রেখে সুমনা দাশগুপ্তকে বল
ডেড্‌বডি রিলিজ করে দিয়েছে, তুমি চলে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরাও উঠতে পারি ?

গম্ভীর মুখে কয়েক পলক চেয়ে থেকে ভদ্রলোক মাথা নাড়ল
অর্থাৎ পারি।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। সুমনা দাশগুপ্ত আগে আ
চলেছে। আজও ইচ্ছে হল ডাকি, বলি, কোথায় যাবেন চলু
পৌঁছে দিচ্ছি। রমেনের সম্পর্কে আমার কথাবার্তা শুনে অবা
হয়েছে, সে দোষী কিনা সেই খটকাও লেগেছে, তবু আজ
প্রত্যাখ্যানই করবে মনে হল। রাস্তায় নেমে আমার গাড়িটার পা
ঘেঁষে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

সেদিকে চেয়ে কমলা শুকনো নিশ্বাস ফেলল একটা। —বেচা
···খুব আঘাত পেয়েছে, কি-যে হয়ে গেল দিনকাল···চল, ও-দি
আবার কি অবস্থা কে জানে।

থানা-অফিসারের মুখে শুনেও অবস্থা এতটা সঙ্কটের দি
গড়িয়েছে কল্পনা করিনি। রমেনের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ান

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মৃত্যু ওর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখামাত্র কমলারও সমস্ত মুখ বিবর্ণ।

…জ্ঞান আছে মনে হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘোলাটে দু'চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে। নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজা, দু'হাত দু'পা বেডের সঙ্গে স্ট্রাপ করা, তা সত্ত্বেও কাতরাচ্ছে আর বিড় বিড় করে বলছে কিছু। ঝুঁকে কান পাতলাম, কি বলছে কিছু বোঝা গেল না।

ডিউটি-ডাক্তার জানালো, গত সন্ধ্যায় অপারেশন হয়ে গেছে, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আপাতত আর একটু কর্তব্য বাকি। নির্লিপ্ত মুখে সেটুকু পালন করলাম। কমলাকে বসিয়ে রেখে কাকা কাকীমা আর বড়দিকে হাসপাতালের ওই ঘরে এনে ছেড়ে দিয়ে আবার নেমে গাড়িতে এসে বসলাম।

শ্মশান।

এখানে এলে সকলেই নাকি সমান হয়। মান অভিমান থাকে না…রাগ বিরাগ থাকে না।

হয়তো থাকে না।

এখানে আমাকে দেখবে সুমনা দাশগুপ্ত কল্পনাও করেনি। কিন্তু সে-বিস্ময় প্রকাশ পেল না। মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

দীপুর দেহ চিতায় তোলার তোড়জোড় চলছে তখন। ওরা বোধহয় সৎকার সমিতির লোক। ‥ আত্মীয়-পরিজন তো নেই-ই আর, ছেলেটার একটা বন্ধুও এসেছে বলে মনে হল না। কারণ অনুমান করতে পারি। ভয়। ভয় মানুষকে কাছে টানে আবার দূরেও সরায়। এ-ক্ষেত্রে হত্যা যারা করেছে তারাই প্রবল, হত্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে তাদের বিরাগভাজন না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এর পরের কাজটুকুর অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালাম। দায়িত্ব পালন

যারা করছিল তারা ধরে নিল মৃতের আত্মীয়া কিছু বলছে না যখন, শেষ সময়ে কোন আপনার জন এসে উপস্থিত হয়েছে।

দাহ শেষ হল। বিকেল তখন পাঁচটার কাছাকাছি। এর মধ্যে সুমনার সঙ্গে পাঁচটা কথাও হয়নি। ও অদূরে একটা শেডের নীচে চুপচাপ বসেছিল। আমি মাঝে মাঝে কাছে বসছিলাম, আবার উঠছিলাম, ঘুরছিলাম।

একটা তাজা তরুণ দেহ ভস্ম হয়ে গেল। এরই থেকে আমি কি আবার কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করছি? কেন কি করছি নিজেই জানি না।

এবারে ফিরবে সকলে। সুমনা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মনে হল সঙ্গের লোকগুলোকে বিদায় করার ব্যাপার আছে কিছু। সুমনা এগিয়ে আসার আগে ওই লোক ক'টিকে নিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম। তারপর কথাবার্তা বলে যা দেবার দিয়ে দিলাম।

সুমনা অদূরে দাঁড়িয়ে দেখল। কাছে আসার পরেও এ-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মনে হল দ্রষ্টার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ও আমার ভূমিকাটা লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

—চলুন।

নিঃশব্দে এবং বিনা আপত্তিতে অনুসরণ করল। গাড়ির সামনের দরজা খুলে দিয়ে বললাম, বসুন।

কয়েক পলক চেয়ে রইল মুখের দিকে। মনে হল, মেয়েটার অনেক—অনেক কালের টান-ধরা স্নায়ুগুলো হঠাৎ সব একসঙ্গে শিথিল হয়ে গেছে। দৃষ্টির গভীর থেকে আমাকে দেখে নিতে আর বুঝে নিতে চাইলেও শিথিল স্নায়ুগুলো সক্রিয় হয়ে উঠছে না।

উঠে বসল।

চলেছে। সামনের দিকে চেয়ে আছে বটে, কোন দিকে কোন পথে চলেছি খেয়াল করছে না।

হাসপাতালের ফটকে ঢুকতে সচকিত একটু। ঘুরে তাকাল

কিছু না বলে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে সিঁড়ির পাশে দাঁড় করালাম।

নেমে এসে বললাম, ছেলেটার অবস্থা ভাল নয়, একবার দেখে যাই। ···আসবেন ?

জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল। ···আসছি শ্মশান থেকে, এসেছি হাসপাতালে আরেক আসন্ন যাত্রীকে দেখতে। এ-সময়েও কোন মেয়ের টানা কালো দুটি চোখের গভীরে হারিয়ে যাবার বাসনা মনের তলায় ছড়িয়ে পড়তে পারে ?

···পারে বোধহয়। মেয়েটার ওইটুকুই রূপ। ওই দুটো কালো চোখ।

বললাম, একটা নিরপরাধ ছেলেকে কাল আপনি অভিসম্পাত করেছেন, আজ একটু আশীর্বাদ করতে পারেন···তাতে আপনার নিজেরই ভাল লাগবে। আসুন না ?

নেমে এলো।

নাটকের মঞ্চ এতটাই প্রস্তুত ছিল ভাবিনি অবশ্য। মুখে আঁচল গুঁজে কাকীমা নিঃশব্দে কাঁদছে। বড়দি আর কমলার থমথমে মুখ, চোখ লাল। কাকা রমেনের মাথার দিকের জানলার কাছে নির্বাক দাঁড়িয়ে।

রমেন আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে না। অক্সিজেনের নলও খুলে নেওয়া হয়েছে। ছেলেটার জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়েছে।
সুমনার দিকে তাকালাম। সে যেন নিস্পন্দ কাঠ একেবারে।

কমলা কাছে এসে ধরা গলায় বলল, ঘণ্টাখানেক আগে গেল ···তুই তখন ছিলি কোথায় ?

—শ্মশানে।

ঈষৎ বিস্ময়ে ও সুমনাকে দেখে নিল একটু। তারপর বলল, হাসপাতালে অপারেশন হয়ে গেছে, আর পোস্টমর্টেমের ঝামেলা

না-ও করতে পারে···এরা রিপোর্ট করেছে, কতক্ষণে হুকুম আসবে কে জানে।

চুপচাপ আরো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ওকে বললাম, পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি। এগিয়ে এসে সুমনার কাঁধের এক-দিক একবার স্পর্শ করলাম শুধু, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ি ছুটেছে। সুমনা মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে টের পাচ্ছি। আমার হাতে স্টিয়ারিং, সামনের দিকে চোখ। বাড়ির এলাকা জানা আছে, আঙুল তুলে বাড়িটা ও-ই দেখিয়ে দিল। মণিদার আস্তানা থেকে মিনিট তিন-চারের হাঁটা পথ। ছোট একটা পুরনো বাড়ির একতলার সামনের দিকের দুটো ঘর নিয়ে ওরা থাকে।

দোরগোড়ায় গাড়ি থামতে সুমনা নামল। গাড়িব আওয়াজ পেয়েই হয়তো দোতলার দু'দিকের ফ্ল্যাট থেকে দুটি উৎসুক মুখ দেখা গেল। একটি বয়স্কা রমণীর মুখ, অপরটি আধ-বয়সী পুরুষের। এ-বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা বাঙালী নয় বোঝা গেল।

বললাম, সমস্ত দিন খুব ধকল গেছে, খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। চান করে খেয়ে একটু ঘুমোতে পারলে অনেকখানি হাল্কা বোধ করবেন।

বলার মধ্যে সহানুভূতির রেশ একটু ছিল বোধহয়। মেয়েটা যেন দু'চোখ দিয়ে সেটুকুই গ্রহণ করল। বলল, আপনারও তো সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি···এর পরেও হবে না।

হেসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গেলাম। সুমনা বাধা দিল। —মুখ হাত ধুয়ে একটু চা খেয়ে নিতে পারেন, বেশি সময় লাগবে না, তাছাড়া শ্মশানে ওদের কত দিতে হয়েছে?

বললাম, সব পরে হবে, এখন সময় নেই।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দশ-পনেরো গজ এগোতে সামনের মিররে চোখ গেল আপনা থেকে। সুমনা দাশগুপ্ত এদিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

মনের জগতের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পা বাড়ানোর জন্য আমরা সম্ভবত পা তুলেই থাকি। কিন্তু বস্তুতন্ত্রীয় জগতে পা ফেলার সেই ক্ষেত্রটা প্রস্তুত হতে সময় লাগে। সেটা পেলে পদক্ষেপ ঘটতে বোধহয় একটুও সময় লাগে না। বাইরের সুস্থির বিচার-বিশ্লেষণে এই ত্বরিত পদক্ষেপ হয়তো বা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

···তোমার রমণীকে তুমি যদি চিনে থাক, সময়ের সমুদ্রটা তাহলে তুমিও হনুমানের মতই একলাফে পার হয়ে যেতে পার। কার রসিকতা ভুলে গেছি। লাফ দেবার জন্য নিজের দিক থেকে প্রস্তুত, কিন্তু রমণীকে ঠিক ঠিক চিনেছি কিনা সেখানেই সংশয় একটু।

বাধা-বন্ধ না মেনে আমি যদি এগোতে চাই এগোতে পারি। পেশাগত কারণে হোক বা যে-জন্য হোক, এগোবার এই সহজ-সরল রীতিতে অভ্যস্ত আমি। সুমনা দাশগুপ্ত চেষ্টা করলেও বাধা দিতে পারবে না। আর, বাধা দিতে সে-রকম চেষ্টাও করবে না হয়তো। বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে একদিনের মধ্যেই তার মনের পরিবর্তনের আভাস মিলেছে।

দিনের মধ্যে বার-কয়েক করে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নিজেকে দেখেছি, কিন্তু ঠিক কি দেখেছি? কি দেখতে চেয়েছি? ···চোখের সামনে কয়েকটি রমণীর মুখ ভেসে উঠেছে। সবার আগে দিলদরিয়া ব্যবসায়ী মহেশ্বর খান্নার বউ দেবী খান্নার মুখ। তারপর বছরে সাত মাস প্রবাসী জাঁদরেল মিলিটারি অফিসারের স্ত্রী মিসেস শীলা কোরেশির মুখ। ··তারপর এ-দিককার অভিজাত সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বামী-পরিত্যক্তা সদা-হাসিখুশি চন্দনাদিদির

মুখ। …এ-রকম আরো কয়েকখানা মুখ যাদের চোখের অভ্যর্থনায় সাড়া দিলে কাছে ডেকে নিতে পারত। এরা সকলেই ক্লায়েন্ট আমার। কিছু আমার গুরু কাজল বোস জুটিয়ে দিয়ে গেছে, কিছু নিজে জুটিয়েছি, কিছু বা আপনা থেকেই জুটে গেছে। স্থির জলে ঢিল ফেললে জল-রেখার বৃত্ত বাড়ে—আমারও বেড়েছে। কিন্তু জলের বৃত্ত দিয়ে কাউকে ধরে রাখা যায় না—ওরাও কেউ আমাকে ধরে রাখেনি। দেবী খান্না আমার মারফত বড় জমি কিনেছে আর বড় বাড়ি কিনেছে একটা। শীলা কোরেশি আমার মারফত বংশের কিছু হীরে-মুক্তো বিক্রী করেছে সংগোপনে। স্থূলাঙ্গী চন্দনাদি কোন সোশ্যাল ফাংশনের কর্তৃত্ব পেলে মোটা কমিশনে সমস্ত টিকিট বিক্রী আর ব্যবস্থাপনার ভার আমাকেই দিয়ে থাকে। এ-ছাড়া ছোটখাট ব্যাপারও অনেক আছে। কেউ গাড়ি বেচে কেউ কেনে, অব্যক্ত কারণে গয়নাপত্র বা দামী কোন জিনিসের বিনিময়ে কাউকে টাকা যোগাড় করে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়, কারো বা দুস্প্রাপ্য কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক, আবার কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে কেউ বা চুপিসারে সে-বস্তু থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।

…গুরু কাজল বোস যা করত, শুধু নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে থেকে আমি তাই করে যাচ্ছি। তার মত অত বেপরোয়া হবার সাহস নেই, মতিও নেই। এ-ব্যাপারে অনেক পুরুষ আর অনেক রমণীর বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গজন আমি। অথচ মনের তলায় গোটাকতক রমণীর মুখই শুধু উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলেছে কেন ?

কারণ, ভয়াবহ এক শূন্যতার গহ্বরে বাস তাদের। সেই শূন্যতা ভরাট করার চেষ্টায় মনের জগতে তারা মাথা খুঁড়ছে। আপন যৌবনের তাপে তারা আত্মদগ্ধ। তাদের রিক্ত তপ্ত বাসনার জগতে আমি কে ? আমি শীতল ঘোষ কতটুকু !

কেউ না। কিছুই না। সেখানে যেটুকু প্রভাব আর যেটুকু প্রতিপত্তি তার সবটাই রক্তমাংসের ওপর ধপধপে চামড়ায় মোড়া

এই কাঠামোটার। মনের জগতে রাজপুত্রের সন্ধান করে না কোন মেয়ে? আমি সেই রাজপুত্রের এক বিদ্রূপ-সংস্করণ।

··আমার গুরু কাজল বোস একদা ঠাট্টা করেছিল, তোমার মত চেহারা থাকলে আমি মেয়ে ভুলিয়েই নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম।

চেষ্টা করলে এখন তাও পারি বোধহয়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের এই চেহারাটার সঙ্গেই বড় বিরোধ আমার। ও যেন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি না চাইলেও ও নিজের অস্তিত্ব আর প্রতিপত্তি জাহির করতে পারে।

···খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুমনা দাশগুপ্তর মধ্যে পরিবর্তনের আঁচ পেয়েছি। সে যদি ওই বিচিত্র পরিস্থিতি আর আমার সহজাত আচরণের দরুন হয়তো আপত্তি নেই। কিন্তু ওই পরিবর্তনের মূলে এই কাঠামোটাই যদি কাজ করে থাকে, তাহলে ··

তাহলে শীতল ঘোষ, তোমার রমণীকে তোমার চিনে নিতে ভুল হয়েছে। আর ভুল যদি নাই হয়ে থাকে তাহলেও সবুর বন্ধু, তাকেও তার পথের সাথীকে চিনে নিতে দাও।

ভিতরের ভাবনা-চিন্তাগুলো আমার এলোমেলো, কখনো বা অস্বাভাবিক। তবু, অনুক্ষণ ভিতরের একটা তাগিদ সত্ত্বেও তিন দিনের মধ্যে আর ও-মুখো হইনি।

চারদিনের দিন সুমনা দাশগুপ্ত নিজেই হাজির। সকাল তখন পৌনে-ন'টা। শ্রীপতি ব্যস্তসমস্ত মুখে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে খবর দিল, সিঁড়ির কাছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

শ্রীপতি এ-যাবত আপিসে দুই-একজন মহিলাকে হানা দিতে দেখেছে, আর টেলিফোনে অনেকের কণ্ঠস্বর শুনেছে। কিন্তু কমলা

আর ভাগ্নি মিমি ছাড়া কোন অপরিচিতাকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে দেখেনি।

বললাম, নিয়ে এসো।

কে এলো অনুমান করতে পেরেছি। মনে মনে নিজের বুদ্ধি আর ধৈর্যের তারিফ করেছি।

দু'হাত তুলে সুমনা ছোট্ট নমস্কার জানাল। ঠোঁটে অপ্রতিভ হাসির মত একটু। কেন যেন মনে হল, ও-ও তিন দিন ধরে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখে শেষে এসেই পড়েছে। মনে হল, অনেক কালের সঙ্কল্পবদ্ধ স্নায়ুগুলোর কাজ ফুরোতে তারা যেন ওই মুখে একটু বাড়তি শ্রী ফোটানোর কাজে লেগেছে। আর মনে হল, ঠোঁটের অল্প-অল্প হাসির ছোঁয়া পেলে ওই দুটো কালো চোখ আরো স্বচ্ছ আর তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে। কয়েক নিমেষের মধ্যেই এমন অনেক কিছুই মনে হয়ে গেল। খুশির অভ্যর্থনা জানালাম, আসুন—

—অসময়ে বিরক্ত করলাম না তো ?

—সুসময়। বসুন। শ্রীপতি—

হাঁক শুনে শ্রীপতি দৌড়ে এলো।

—চা, আর সেই সঙ্গে যা তোর খুশি।

ও চতুর লোক, কতটা আপ্যায়ন করা দরকার এই থেকেই বুঝে নেবে। সুমনা বাধা দিতে গিয়েও দিয়ে উঠতে পারল না। শ্রীপতি চলে গেল।

সামান্য দ্বিধা কাটিয়ে সুমনা জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আপনার কত লেগেছিল ?

ছন্দপতন ছাড়া আর কি ? —বারো টাকা।

হাতব্যাগ খুলে টাকা বার করল, কিন্তু সুচারু সংকোচে বলে উঠতে পারল না, এই নিন বারো টাকা। চেয়ার ছেড়ে উঠে সামনের টেবিলে রেখে পেপারওয়েট চাপা দিল। আমি চেয়ে আছি।··· মণিদা বলেছিল পিছন থেকে মেয়েদের—ধ্যেৎ, ঘণ্টা !

ফিরে এসে বসল। বলল, এর মধ্যে আপনি আমাদের ওখানে একবার যাবেন ভেবেছিলাম।

—টাকা আনতে?

—তা না, এমনি ভেবেছিলাম···এলেন না দেখে মণিদার কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করে নিজেই এলাম।

—টাকা দিতে?

যতটুকু মানায় মুখে ততটকুই বিড়ম্বনার আঁচড়। —না বুঝে পর পর দু'দিন আপনার সঙ্গে কত অভদ্র ব্যবহার করেছি, অথচ সেদিন আপনি আমার জন্যে কত করলেন···কেন করলেন?

বললাম, আপনার দু'দিনেরই অভদ্র ব্যবহার আমার ভাল লেগেছিল, তাই।

মুখের ওপর কালো চোখ পলকের জন্য স্থির। মেয়েরা অনেক সময় পুরুষের দিকে সরাসরি চেয়ে থাকতে পারে। আবার কোন কোন পুরুষও পারে ফিরে চেয়ে থাকতে। আমি অন্তত পারি। কিন্তু দু'জোড়া চোখের মাঝে শূন্য সেতুপথে এই প্রথম কি একটা স্পর্শ অনুভব করলাম বুঝি।

ট্রে-তে একরাশ খাবার আর চা নিয়ে শ্রীপতি ঘরে ঢুকল। ছোট টেবিলের ওপর ট্রে-টা রেখে টেবিলসুদ্ধ তুলে এনে দুজনের মাঝখানে বসিয়ে দিল। খাবারের পরিমাণ দেখে সুমনার কালো চোখ কপালে।

—এত কি হবে?

শ্রীপতি সবিনয়ে হাসতে লাগল।

বললাম, ওর খুশির ওপর নির্ভর করেছিলাম, কতটা খুশি হয়েছে বুঝে নিন।

পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীপতি ধর খুশি বদন আড়াল করল। হাসিমুখে সুমনা চামচে করে একটা ডিশে খাবার সরিয়ে রাখতে লাগল। এও দেখতে ভাল লাগছে···মণিদার চটক-চাওয়া মেয়ের সঙ্গে এই অপচয় এড়ানোর শ্রীটুকুরও যেন মিল নেই। বললাম, অত

তোলার কি আছে, শুরু করুন না, সকালে তো কিছু খেয়ে বেরোন নি। বড়জোর এক পেয়ালা চা খেয়েছেন—

—আপনাকে কে বলল?

—আসবেন কি আসবেন না ঠিক করতেই অনেকক্ষণ সময় গেছে, তারপর মন স্থির করে কাপড়জামা বদলে আসা। হাসছি। —মুখ দেখে এরকম অনেক কথা বলে দিতে পারি···বলব?

মনে মনে কি চাইছিলাম আমি? চাইছিলাম ওই দুটো চোখ বার বার আমার মুখের ওপর উঠে আসুক, স্থির হয়ে থাক। দৃষ্টির এই স্পর্শটুকু অননুভূত যেন।

তাই হল। হাতের চামচের মিষ্টিটা সরিয়ে রাখতে ভুলে মুখে তুলল। চিবুনোর ফাঁকে আর অল্প-অল্প হাসির ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের আভাস চিকিয়ে গেল। সামান্য মাথাও নাড়ল, অর্থাৎ বলতে পারি।

পা দুটো তুলে যোগাসনের মত তৈরি হয়ে বসলাম। —দীপু ওভাবে চলে যেতে প্রথমে আমি কোন ছার, এই দুনিয়া ছারখার করে দেবার মতই ঝলসে উঠতে চেয়েছিলেন আপনি। তারপর শ্মশান আর হাসপাতাল থেকে ফেরার পর মনে হয়েছে কতকালের একটা পাগলামী আপনার মাথা থেকে খসে গেছে। ···তার ফলে এই তিনদিন আপনি অঢেল ঘুমিয়েছেন, নতুন রিসেপশনিস্টের অভাবে আপনার নতুন মনিবেরা তিনদিন ধরে দিনমানে অন্ধকার দেখছে চোখে।

খাওয়া ভুলে মুখের দিকে চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। আত্মস্থ হল, তারপর মুখের হাসি অকৃপণ আরো একটু।

—মণিদা মিথ্যে বলেনি দেখছি।

—কি বলেছে মণিদা?

চামচে তুলে এটা-ওটা খাচ্ছে। আমার প্লেট তেমনি পড়ে আছে তাও খেয়াল করছে না। —বলেছে আপনি খুব সাংঘাতিক লোক।

ভিতরে ভিতরে আমি সচকিত একটু। কি বলেছে বা কতটা বলেছে মুখ দেখে বোঝা গেল না। মণিদার মগজের মধ্যে এখনো আমি ভাল করে প্রবেশ করতে পারিনি। বাইরের আচরণে অন্তত নিজের ওপরে দখল রেখে অভ্যস্ত, অথচ সবটা শোনার আগে ফস করে বলে ফেললাম, মণিদা রসিক বটে, আপনার সম্পর্কেও অনুরূপ প্রশংসা আমার কাছে করেছেন।

একটুও বিব্রতবোধ করল না। খাবার রেখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সাদাসিধেভাবেই বলল—তা তো করবেনই, আমাকেই ধরে কত সময় কত উপদেশ দিয়েছেন, আগে বকা-ঝকাও করতেন। ···ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন···আমার চালচলন তাঁর একটুও পছন্দ নয়।

চটক-চাওয়া মেয়ের হাবভাব কথাবার্তা এমন সহজ আর এত অকৃত্রিম হয়? আমি অনেক দেখেছি, হয় না বলেই ধারণা।

হেসে বললাম, বেশ। ···তারপর আমি কি-রকম সাংঘাতিক লোক বলল মণিদা?

—শুধু ও-ই বলেছেন। তার আগে অবশ্য আপনার খুব প্রশংসা করেছেন, ইচ্ছে করলেই আপনি দেদার টাকা রোজগার করতে পারেন, দরাজ হাতে অনেক খরচও করেন, তাঁরও অনেক উপকার করেছেন তাও বলেছেন, কোন ব্যাপারে আপনার ভয়-ডর নেই, কাউকে পরোয়া করেন না—তারপর ওই কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন।

—তার পরেও সাহস করে এলেন?

—এলাম তো। আসলে আপনাকে তিনি ভালবাসেন, আমার মত একটা মেয়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করবে সেটা চাননি বোধহয়। তাছাড়া দু'পাঁচজন কম-বেশী সাংঘাতিক লোক আমিও দেখেছি, অত ভয়-ডর নেই।

কান পেতে শুনছি আর দুচোখ ভরে দেখছি।

…ভুলে-যাওয়া সেই সুরসিকের উক্তি অনস্বিকার্য। তোমার রমণীকে তুমি যদি চিনে থাকো, সময়ের সমুদ্রটা তাহলে তুমিও হনুমানের মতই একলাফে পার হয়ে যেতে পারো। চিনেছি বিশ্বাসে চোখ-কান বুজে লাফ দিয়েছি, আর মনে হয় তিন মাসের ফারাকটা তিন দিনে উতরে গেছি।

পর পর তিন দিনই গেছি। তার আপিস কামাই হয়েছে, আমারও কাজকর্মে জলাঞ্জলি আপাতত। পাশের ঘরে তার মায়ের অবস্থান, জানি। কিন্তু সে ভদ্রমহিলার অস্তিত্বও সব-সময় মনে থাকেনি। আজও ও-বাড়িতে যখন উপস্থিত আমি, সুমনা বেরুবার জন্য তৈরি হয়েছে।

আমাকে দেখে হাল ছাড়া বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ল যেন।
—আপিসে বেরুচ্ছিলাম যে।

বললাম, এ ক'দিনে এই রিসেপশনিস্টের আশা ছেড়ে তোমার মালিকেরা অন্য রিসেপশনিস্ট যোগাড় করে ফেলেছে নিশ্চয়।

এখানে প্রথম দিনের পদার্পণেই অনায়াসে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে পাড়ি দিতে পেরেছিলাম। কালো দুই চোখ-মুখের ওপর একটু থমকেছিল বটে, কিন্তু আপত্তির লক্ষণ কিছু দেখিনি।

আজকের কথা শুনেও উতলা মনে হয়নি একটুও। মুখে অবশ্য বলেছে, অন্য রিসেপশনিস্ট নিয়ে থাকলে সেটা কি আমার পক্ষে আনন্দের কথা হল ?

—খুব হল। এর থেকে ঢের ভাল ভাল চাকরি ছেড়েছ, আর একটা ছাড়ার সুযোগ পেলে।

—বেশ কিছু ধরলে তবে তো ছাড়ার চিন্তা।

—ধরে ফেলো।

—আপনাকে ?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম, তাই।

—কিন্তু কাল তো বললেন আপনি আসলে যা করেন তার নাম ভাঁওতাবাজী ?

—নির্জলা সত্যি। তোমার পোস্ট···ভাঁওতা-সহকারিণী। এ কাজে স্পোর্ট আছে, অথচ টাকাটা নির্ভেজাল।

সুমনা হাসছিল। বলল, আপনি ডাকবেন আশা করেছিলাম অবশ্য, মণিদা আগেই···যাক্ গে, মাইনে কত দেবেন ?

মণিদা কিছু বলে থাকবে। জাহান্নমে যাক মণিদা। বললাম, এখন যা পাচ্ছ তার ডবল, তার ওপর যত লাগবে তত। আর ব্যবসা জমিয়ে তুলতে পারলে আনলিমিটেড স্কোপ—

—বুঝলাম। ডিউটি কেমন ?

—ঘড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সকাল দুপুর বিকেল, রাত্তির—যখন দরকার তখনই ডিউটি।

—ও বাবা ! এ চাকরির মেয়াদ কত দিন ?

—যত দিন চাইবে তত দিন, না চাইলে তুমি দক্ষিণে আমি উত্তরে। রাজী ?

—লোভ হচ্ছে। ভেবে দেখি। হালকা খুশির মুখেও হঠাৎ যেন বিমনা একটু। সোজাসুজি চেয়ে রইল খানিক। বলল, বেশি পাওয়ার সময়-সময়েই ঠিক যেন আমার ছাড়ার বরাতটাও এগিয়ে আসে···।

সাধারণ ক'টা কথা ভিতরে যেন একটা ছাপ মেরে দিয়ে গেল। চুপচাপ আমিও দেখলাম ওকে একটু। বললাম, সেটা বেশি পাওয়ার সময় নয় তাহলে। যাক, আমি বিকেলে আবার আসছি, তখন পাকা কথা হবে।

বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব, চোখ দুটো হঠাৎ রাস্তার ও-ধারের অপরিচিত অপ্রসন্ন একখানা মুখের ওপর হোঁচট খেল একপ্রস্থ। পরনে পা-জামা, গায়ে আধময়লা চুড়িদার পাঞ্জাবী, বছর ছাব্বিশ-সাতাশের এক মাতব্বর ছোকরা, বুক টান করে দাঁড়িয়ে সিগারেট

টানছে। কপালের ওপর আড়াআড়ি মস্ত একটা শুকনো ক্ষতর দাগ। এমন করে চেয়ে রইল আমার দিকে যার একটা অর্থ হতে পারে, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

হঠাৎ এই অচেনা ছোকরার বিরাগভাজন হলাম কেন চট করে মাথায় এলো না।

গাড়িটা সামনের বাঁক নেবার আগে আর একবার ঘুরে তাকালাম। এদিকেই চোখ রেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

রকম-সকম ভাল লাগল না। ক'দিন আগে ওই বাড়িরই এক ছেলে খুন হয়েছে। ছোকরা কে আর কি মতলব বোঝা গেল না।

একটু বাদেই ভুলে গেলাম। সুমনার অল্প-অল্প হাসি, টুকরো-টুকরো কথা, আর কালো চোখ নিয়ে ভিতরটা অনেকখানি তন্ময়। ওগুলোর মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই বলেই চোখ কান মন টানে। ...মণিদা বলেছিল, লোকের চোখে ভাল লাগানোর মত মেয়েটার ফরমূলাও কিছু জানা আছে, সে কি এই ফরমূলা নাকি? তা যদি হয় তো আপত্তি নেই।

বাড়িতে পা দিতে না দিতে তালভঙ্গ।

সিঁড়ির মুখে আমার লেটার-বক্স। খুলে দেখি ভিতরে খাম একটা, কিন্তু কোন ডাকটিকিট নেই। খামের ওপর কাঁচা হাতে ইংরেজীতে আমার নাম লেখা: Sital Gosh। বানানের চোটে আমার নামটাই থ্যাবড়া যেন।

খাম খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকলাম। তারপরেই ছ'চক্ষু স্থির আমার। নীচে প্রেরকের জায়গায় লাল কালির ছোরা-আঁকা বাংলা চিঠি একখানা। বাংলা বানানেরও একই দুরবস্থা। চিঠির সারমর্ম—আমি গাড়ি হাঁকানো একটি 'বুর্জুয়া' নরাধম, এখনো 'সাবধান' না হলে চরম 'সাস্তি' আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি 'নিলজ্জ' বেইমান, বেহেয়া, তাই যার জন্য রমেন ঘোষ মারা গেল তার বোনের সঙ্গে এখন ঢলাঢলি 'ফষ্টি-নষ্টি' আরম্ভ করেছি। যত নষ্টের 'মূল' ওই

চলানী, তার 'ব্যবস্থা শীঘ্রই হইতেছে', কিন্তু আমি যদি জীবনে আর ওমুখো হই তাহলে এটাই শেষ ওয়ার্নিং।

শ্রীপতি আপিসে চলে গেছে, তার পরেই কেউ এসে এটা চিঠির বাক্সয় ফেলে গিয়ে থাকবে। নিজের জন্য নয়, সুমনার জন্যই কেমন ভয় ধরে গেল। ...রাস্তার সেই কপাল-কাটা ছেলেটাই বা কে?

কিছু করা উচিত, নাকি বাজে হুমকি ধরে নিয়ে চিঠি ফেলে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটু বাদে সিঁড়িতে খুব মৃদু পায়ের শব্দ কানে এলো, কেউ যেন পা টিপে টিপে উঠে আসছে।

দরজার কাছে এসে আমি অবাক একটু। সন্তর্পণে উঠে আসছে বড়দির মেয়ে, ভাগ্নি মিমি। মুখ তুলে দরজার কাছে আমাকে দেখে থতমত খেল একটু। —মামা আজ আপিসে যাওনি?

—আপিসে গেছি ধরে নিয়েই তুই এসেছিস নাকি?

—না, তোমাকে পেতে পারি ভেবে এলাম।

ঘরে ঢুকে ধুপ করে বিছানাতেই বসে পড়ল। আমার মনে হল ও যেন কিছু একটা উত্তেজনা চাপতে চেষ্টা করছে।

—তোর দাদু-দিদার খবর কি?

—তারা এখনো বিছানা ছেড়েই উঠছে না। ছোটমাসি ওখানে আছে বলে জোরজার করে খাওয়ানো যাচ্ছে।

—তারপর তুই হঠাৎ যে? কি বলবি বলে এসেছিস বলে ফ্যাল।

মিমির সন্ত্রস্ত চাউনি আবার। আমার মনে হল এ ক'দিনের মধ্যেই মেয়েটা যেন আরো বড়সড় হয়ে গেছে। কোন দাদা-টাদার ব্যাপার কিনা আবার, কে জানে।

ঢোঁক গিলে গিলে মিমি বলল, ওই যে মামুর আগে যে ছেলেটা মারা গেল ··দীপু না কি নাম·· অমরদা বলছিল তার দিদির সঙ্গে নাকি আজকাল তোমার প্রায়ই দেখাশুনা হয়···সত্যি?

যত পাখাই গজাক, এ-প্রসঙ্গে মজার গন্ধ পেয়ে এসে হাজির

হবার সাহস ওর হবে না। যে-কারণেই হোক ও বেশ ঘাবড়ে গেছে, সে-জন্যই না এসে পারেনি। সায় দিলাম, সত্যি —কেন বল তো ?

—তোমাকে একটা সাংঘাতিক খবর দেব মামা, কিন্তু তুমি কাউকে বলবে না ? একেবারে কাউকে না ?

মাথা নাড়লাম, বলব না।

—দলাদলির ব্যাপারে আছে অবশ্য, কিন্তু ওই দীপু ছেলেটার দিদিকে নিয়েই আসল গণ্ডগোল...এর পেছনে পয়সঅলা লোক কেউ ছিল, কিন্তু পুলিস মামুকে মেরে দিতে ওরা একেবারে ক্ষেপে গেছে, ওই মেয়েটার ওপর শোধ তুলবেই প্রতিজ্ঞা করেছে, বোমা-বন্দুক নিয়ে আজ রাতেই তারা বাড়ি চড়াও হয়ে মেয়েটাকে বার করে নিয়ে যাবে—শেতলমামা কি হবে ?

আমি স্তব্ধ খানিকক্ষণ। এখানে অসম্ভব বলে কিছু আর নেই। বাপ মা ভাইয়ের সামনে মেয়ে নিয়ে যাওয়ার খবরও কাগজে বেরোয়। জিগেস করলাম, তোর অমরদা দলের খবর জেনে তোকে এসে বলেছে ?

মিমির চোখে-মুখে ত্রাস, শেতলমামা, তুমি ভুলেও এ-নাম উচ্চারণ কোর না, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুঝতেই তো পারছ, ভালো দল-টল এখন আর নেই, তার মধ্যে এইসব লোক এসে জুটেছে... যারা ভালো তারা মুখ বুজে একপাশে সরে আছে, হাঁক-ডাক করে দল ছাড়তে গেলে ওরা প্রাণ নিয়ে ছাড়বে—খবরটা অমরদার কানে এসেছে, কিন্তু একেবারে পাকা খবর, আজ রাতেই সাংঘাতিক কিছু হয়ে যাবে।

মিমি চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম। ছোরা-আঁকা হুমকির চিঠিটা সঙ্গে নিয়েছি।

প্রথমে থানায় এসেছি। তারপর আপিসে।

কিন্তু ভিতরটা ভয়ানক অশান্ত। পুলিসের ওপর আদৌ নির্ভর

করে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটার ওপর কতখানি গুরুত্ব দিয়েছে তারা তাও সঠিক বোঝা যায়নি। তাছাড়া পুলিসের নাকের ডগা দিয়েও তো এ-যাবত কম কাণ্ড ঘটে যায়নি।

কি ভেবে মণিদার আপিসে টেলিফোন করে জানলাম, সে তিন দিন ধরেই আপিসে আসছে না—অসুস্থ। গাড়ি হাঁকিয়ে তার বাড়ির দিকে ছুটলাম আবার।

জানলা দিয়ে দেখলাম মণিদা শয্যায় বসে আছে চুপচাপ। সাড়া পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে দিল। —কি ব্যাপার এ-সময়ে তুমি!

বাইরের দরজা আবার টেনে দিয়ে বিছানার সামনে চেয়ারটা টেনে বসলাম। —আপিসে ফোন করে জানলাম তোমার শরীর খারাপ। চলে এলাম—

—কি ভাগ্য! ডাক্তার হৃদযন্ত্রের গোলযোগের আভাস দিচ্ছে ···কিন্তু এই গোলযোগটা তোমার আপাতত আরো বেশি মনে হচ্ছে?

ঠাট্টা করে জবাব দিলাম, তোমার অঙ্কের মাথা তাই বলছে বুঝি, আর সেই জন্যেই আগে থাকতে তুমি সুমনা দাশগুপ্তর কাছে আমার একটু নিন্দে-টিন্দেও করেছ।

মণিদাও হাসতে লাগল। তারপর বলল, নিন্দে করেও তোমার দুর্ভোগ ঠেকানো গেল না মনে হচ্ছে। তুমি বন্ধু, মেয়েটা তোমাকে শিকার না ঠাওরায় সে-চেষ্টা একটু করেছিলাম বটে, কিন্তু ধুরন্ধর মেয়ে আবার তোমার কাছেই সে-সব লাগিয়েছে!

কেন যেন ভালো লাগল না কথাগুলো। হয়তো দুর্বলতা নইলে এই লোকের আমার ভালোর দিকটা চিন্তা করাই স্বাভাবিক। মণিদা গম্ভীর হঠাৎ। —একটা কথা তোমাকে পষ্টাপষ্টি জিগেস করি। দীপু মরে যাবার ফলে ওই মেয়ে অনেক রকম শাসাচ্ছে আর থানায় যাতায়াতও করছে খুব—ও-দিক থেকে টানা-হেঁচড়ার ভয়েই কি তুমি মেয়েটার তোয়াজ তোষামোদ শুরু করে দিয়েছ?

—কি রকম ?

—শ্মশানে গেছলাম শুনলাম, তারপর মাঝে মাঝে এসে দেখাও করছ নাকি··· ।

—তোমাকে কে বলল ?

—সুমনাই। ···তোমার সম্পর্কে ওর জানার আগ্রহটা স্বাভাবিক কিন্তু তোমার সমস্যা কি ? আর পলিটিক্যাল মার্ডারের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাই বা কি ?

···ঠিক পলিটিক্যাল মার্ডার নাও হতে পারে, শুনেছি সুমনার দিকে পয়সাঅলা লোকের চোখ আছে।

মণিদা ভুরু কুঁচকে মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, পয়সাঅলা লোকের চোখ তো আজ থেকে নেই, আট-দশদিন আগে পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে এক-একখানা গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত। ···তাছাড়া গঙ্গার ধারের সেই অবাঙালী লোকটাকে মনে আছে? সেই যার হাতে ধরে দেবী হাওয়া খাচ্ছিলেন, গাড়ি চড়ে এ-রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমাকে এখানে দেখে এমন করে তাকালো যেন জল দিয়ে গিলে খাবে···কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, এ-সব লোকের যে-মতলবই থাক, কোনরকম খুন-খারাপীর ধারে-কাছে ঘেঁষবে না কক্ষনো। কিন্তু তোমার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন, ইদানীং বাজে লোকের আনাগোনা দেখছি এ-পাড়ায়, কারো কিছু মতলব থাকতেও পারে···আমি তো মেয়েটাকে পষ্ট বলে দিয়েছি দিনকতক এখন আমার বাড়িতে এসো-টেসো না, আমি নিতান্তই ছা'পোষা মানুষ—আর পারো তো নিজেও কিছুদিন ঘরে সেঁধিয়ে থাকো—এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কে জানে কার মাথায় কি ঘুরছে।

এ-কথা শোনার পরে মণিদাকে আসল বিপদের আভাস দেওয়া নিরর্থক। পুলিসও এ-ব্যাপারে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে নিষেধ

করেছিল। এত যার ভয়, এত-সব শুনলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে।

বিকেল তখন সাড়ে-পাঁচটা। ঘণ্টাখানেক ধরে অধীর আগ্রহে আপিসঘরে অপেক্ষা করছিলাম। ঘরের অন্য অংশীদাররা কেউ নেই, আমি একা।

দরজার সামনে ট্যাক্সি থামতে আমি সচকিত, উদগ্রীব। তারপরেই নিশ্চিন্ত···ট্যাক্সি থেকে সুমনা নামছে, শ্রীপতি আগেই নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে।

ওই মার্কা-মারা গাড়ি নিয়ে নিজে আর ওর বাড়ি যেতে সাহস করিনি। চিঠি লিখে শ্রীপতিকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—এর সঙ্গে আমার আপিসে চলে এস, বিশেষ দরকার, আর বাড়িতে বলে এস ফিরতে রাত হতে পারে। ···শ্রীপতিকে বাড়িতে দেখেছে তাছাড়া ঘাবড়াবার মেয়ে নয় আসবে আশা করছিলাম। এসেছে। ওকে বসতে বলে শ্রীপতিকে আড়ালে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, আসার সময় ওই বাড়ির কাছে কোন লোক দাঁড়িয়ে ছিল কি না। শ্রীপতি জানাল, কেউ ছিল না, বা কেউ দেখেনি।

এরপর সুমনা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ?

···হ্যাঁ, বেশ সেজেই এসেছে, কিন্তু চটক-চাওয়া মেয়ের মত আতিশয্য কোথাও চোখে পড়ল না। যে-কোন পুরুষের হুচোখ প্রসন্ন হবার মতই শুধু।

—ব্যাপার বিশেষ কিছু না, আজকের থেকেই কিছু যোগাযোগের কাজ শুরু হয়ে যাক—

—ও মা ! এই জন্যে এভাবে তলব। আমি ভাবলাম কি না কি—

না চাইলেও মণিদার মন্তব্যগুলো মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দেয়ই। ···এই অকৃত্রিম সহজতাই কি মেয়েটার পুরুষ ঘায়েল করার প্রধান

অস্ত্র? জিজ্ঞেস করলাম, ফিরতে দেরি হতে পারে বাড়িতে বলে এসেছ?

হাসল একটু। —বলার দরকার হয় না। ···কিন্তু সবে তো বিকেল এখন. কত আর দেরি হতে পারে?

—কে জানে, চল। বাড়িতে বলে আসার দরকার হয় না শুনে তেমন ভালো লাগল না, কারণ ও-টুকু মণিদার অনেক মন্তব্যের সঙ্গে মেলে।

গাড়ি ছুটেছে। পাশে সুমনা বসে। হাওয়ায় ওর কয়েকগোছা শুকনো চুল উড়ছে। কিন্তু যে-নাটকে পদার্পণ আমার তার শেষ নিয়েই ভিতরটা আচ্ছন্ন। প্রায় নিঃশব্দে চলেছি দেখে সুমনা হয়তো বা মনে মনে অবাক হচ্ছে।

একে একে তিন বাড়িতে গেলাম ওকে নিয়ে। প্রথমে দেবী খান্নার বাড়ি, তারপর শীলা কোরেশির বাড়ি, তারপর চন্দনাদির বাড়ি। কোনটার কাছে কোনটা নয়। হাসিমুখে সকলের কাছেই আমার সহকারিণী বলে পরিচয় দিয়েছি সুমনার। স্বভাবতই সহকারিণী শব্দটার ওরা মনের মত অর্থ বানিয়ে নিয়েছে। দেবী খান্না তো হঠাৎ আমার মাথাটা দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে কানে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে একটা চটুল প্রশ্ন করল। সেটা ও মেয়ে শুনতে না পেলেও এটুকু দেখেই দুই চক্ষু স্থির তার।

···মিসেস কোরেশি ঠারে ঠোরে হেসেছে, আর চন্দনাদি জিজ্ঞাসা করেছে, নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—হ্যাঁ।

—পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—পাকা করার ইচ্ছে আছে।

খুব কাছে এসে চন্দনাদি আদর করে পিঠে হাত বুলিয়েছে, আ-হা গো, পাকা লোকের বড় অভাব ছিল তোমার।

আবার গাড়ি ছুটেছে। রাত তখন আটটা বেজে গেছে। সুমনা গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করল, আরো আছে না এই শেষ?

—আছে অনেক, তবে আজকের মত এই শেষ।

—আপনার ক্লায়েন্টরা সকলেই মহিলা নাকি ?

—না, পুরুষও অনেক আছে, তবে এদের কাছে আমার প্রতিপত্তি বেশি।

—কিন্তু এদের একজনকেও আমাব ভাল মনে হল না।

জবাবটা ফস করেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। —রতনে রতন চেনে···

—কি বললেন ?

ঘাড় ফিরিয়ে সোজা মুখের দিকে তাকিয়েছে। গলার স্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ। ব্যতিক্রমটুকু স্বাভাবিক মনে হল না খুব। যে-পথে এই মেয়ে চলে অভ্যস্ত, এটুকু ঠাট্টা ঢোঁক গিলে বরদাস্ত করার কথা।

বললাম, এখন কিছু খাওয়ার উদ্যোগ করা যাক।

আমার মগজে আপাতত অন্য চিন্তার ঠাঁই নেই। ···এ-সময়ে কমলাটা তার নিজের বাড়িতে থাকলেও কাজ হত, সোজা নিয়ে গিয়ে ওর ওখানে তুলতে পারতুম।

একটা নামী হোটেলে খাওয়া সারতে ইচ্ছে করেই সময় নিলাম। অথচ কথাবার্তা তেমন আর জমছে না। অন্য চিন্তায় ভিতরটা আমার খুব সুস্থির নয়, ওরও কোথায় যেন একটু তালভঙ্গ হয়েছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে অনির্দিষ্টের মত খানিক ঘোরাঘুরি করে বাড়ির পথে গাড়ি ছুটল যখন, রাত দশটা বেজে গেছে।

সুমনা মাঝে মাঝে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিল আমাকে টের পেয়েছি। আমার মাথার মধ্যে কিছু একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে ও কি সেটা অনুভব করতে পেরেছে ? গাড়িটা আমার বাড়ির দরজায় থামতেও কোন প্রশ্ন না করে চুপচাপ মুখের দিকে তাকাল শুধু।

দরজা খুলে নেমে পড়লাম। ওকে বললাম, নামো—

সুমনার ঠাণ্ডা দু'চোখ ওর হাতের ঘড়ির দিকে নামল একবার। ততক্ষণে ঘুরে ওর দিকের দরজাটা খুলে দিয়েছি। আবছা অন্ধকার

ফুঁড়ে সোজাসুজি তাকাল আবার। বলল, রাত সোয়া-দশটা প্রায়—

বললাম, তোমাকে বলেছিলাম, বিশেষ দরকার আছে, সেটা মিথ্যে নয়। এসো—

নেমে এলো। হয়তো ভেবেছে এরই মধ্যে আমি কোন ভবিষ্যতের প্রস্তাব উত্থাপন করব। —বলুন।

—এখন নয়, ওর হাত ধরলাম, এসো ব্যাপারটা সত্যি সীরিয়াস—

ভিতরে ঢুকলাম। পাশাপাশি ওপরে উঠলাম। দোতালায় সিঁড়ির মুখে শ্রীপতি দাঁড়িয়ে। এই রাতে দু'জনকে দেখে ও হকচকিয়ে গেল একটু।

ওকে বললাম, আমরা খেয়ে এসেছি, ও খেয়ে নিতে পারে। সুমনাকে নিয়ে নিজের ঘরে এলাম। —বসো।

ও বসল না, দাঁড়িয়েই রইল।

—শোন, একটা বিশেষ খবর পেয়ে নিজে না গিয়ে শ্রীপতিকে পাঠিয়ে তোমাকে আনিয়েছিলাম। ···সকালে তোমার ওখান থেকে আসার সময়ে নিজের চোখেও সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলাম, তা'ছাড়া একটা উড়োচিঠিও আমার হাতে এসেছে। ···মোটকথা আজ তোমার ওখানে বড় রকমের কিছু গণ্ডগোল হতে পারে, রাতটা ও-বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

ওই মুখে আর কালো চোখে অবিশ্বাসের সঙ্গে একধরনের স্তব্ধতা জমাট বাঁধতে লাগল। —তাহলে কোথায় থাকতে বলছেন, এখানে?

—হ্যাঁ। ভিতরে ভিতরে নিজেও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম কেমন। শুধু অবিশ্বাস নয়, শুধু রাগ নয়, ওই দুই চোখে ঘৃণাও উপছে উঠতে দেখছি।—বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?

চেয়ে আছে।—বিপদের হাত থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করবেনই তাহলে? যেতে দেবেন না?

জবাব না দিয়ে হাঁক দিলাম, শ্রীপতি।

এঁটো হাতে শ্রীপতি দৌড়ে এলো।

—রাত্রিতে বাইরে এই ঘরের দরজার সামনে শুবি তুই, ইনি এখানে থাকবেন। যা—

শ্রীপতি চলে যেতে বললাম, তুমি অবিশ্বাস করলেও রাতটা কেটে যাবে, দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়, গুড্‌নাইট্‌—

দরজার দিকে এগিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। রমণীর স্তব্ধ দৃষ্টি চকিতে টেবিলের ওপরের টেলিফোনটার দিকে ঘুরতে দেখেছি। ওর মতলব বুঝে নিতে সময় লাগল না। ফিরে এসে একটা হ্যাঁচকা টানে টেলিফোনের তারসুদ্ধু ছিঁড়ে ফেললাম।

নিজেই অনুভব করছি, আমার মাথায়ও একটা পাগলামিই চেপে বসেছে।

রাতে ঘুম প্রায় হলই না। ভোর ছ'টায় শ্রীপতির ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বারান্দায় শ্রীপতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখনো। আমার ঘরের দরজা আধা-আধি খোলা।

দরজা ঠেলে ভিতরে এলাম। সুমনা শয্যায় বসে আছে চুপচাপ। এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল, রাত এরও বিনিদ্র কেটেছে। খুবই স্বাভাবিক। শ্রান্ত দুই চোখ আমার দিকে তুলল।

—রাতটা নির্বিঘ্নে কেটেছে তাহলে?

জবাব দিল না।

—চলে এস। এবারে দেখা যেতে পারে বিপদটা মিথ্যে কি ভুয়ো।

ওদের বাড়িতে পা দেবার আগেই, অর্থাৎ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ছোটখাট কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। ওদের সদর দরজা ভাঙা, ঘরের সারশির কাঁচ ভেঙে ছত্রখান। আমাদের দেখে আশপাশের জনাকতক লোক এগিয়ে এলো।

সমস্ত সমাচার শোনার পর সুমনার দিকে তাকালাম। স্তব্ধ চোখে ও আমাকেই দেখছে।

···মাঝরাতে একটা জীপে করে কারা এসেছিল। রাস্তার সব আলো তখন কি করে যেন নিভে গেছল। দরজা ভেঙে দু'তিনজন লোক সুমনাদের ঘরে ঢুকেছিল। বাইরে দুটো বোমা ফাটতেই বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের হট্টগোল চেঁচামেচি থেমে গেছল। তারপরেই জোরে হুইসল্ বেজে ওঠে একটা। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডারা ছুটে এসে জীপে উঠে পড়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে যায়। দূর থেকে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা পুলিসের গাড়ি ওদের ধাওয়া করে। তার পর আর কেউ কিছু জানে না।

ভিতরে ঢুকতে সুমনার মা জানাল, গুণ্ডারা তার বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে জানতে চেয়েছে মেয়ে কোথায়। ভয়ে আর ত্রাসে সুমনার মা আমার নাম করেছে, কারণ মেয়ে বলে গেছল কোথায় যাচ্ছে। তবু ওরা মেরেই ফেলত বোধহয়, পুলিস আসার সংকেত শুনে তীরের মত ছুটে পালিয়েছে।

···সুমনার মুখখানা এই দিনমানে বড় লোভনীয় লাগছিল আমার।

জীবনের এই নাটক দুরন্ত দ্রুত গতিতে খুব একটা গতানুগতিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে কিনা, জানি না।···সুমনা নিজেই একদিন বলেছিল, বেশি পাওয়ার সময়-সময়েই ওর ছাড়ার বরাতটাও-এগিয়ে আসে। মাত্র দেড় মাসের মধ্যে সংশয়ের এই দ্বন্দ্বও ওর ঘুচে গেছে কিনা বলতে পারব না।

ওই অঘটনের সেতুর ওপর পা ফেলেই অনায়াসে ও যেন অনেক কাছে এগিয়ে আসতে পেরেছে—নানা আচরণেব মধ্যে দিয়ে সেটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। কিন্তু না, চটক-চাওয়া মেয়ের মত সে-আচরণ প্রগল্‌ভ নয় একটুও। পুরুষের জীবনে পদক্ষেপের একটা অনায়াস অথচ আত্মস্থ রীতি ওর জানা আছে। অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও নিজেকে অনেকটাই ধরে রাখতে পারে এই মেয়ে।···এটুকুরই যেন মাধুর্য ঢের বেশি।

সেই দুর্যোগের পরে দিনকতক আমারই জন্য একটা ত্রাসের মধ্যে কেটেছে ওর। কারণ দু'দিন বাদে ডাকে জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েছে বলে মার্কা-মারা নোটিস এসেছে আমার নামে। সুমনা উঠতে বসতে সাবধান করেছে আমাকে, রোজ একবার করে থানায় ছুটেছে খবর নিতে আর পরামর্শ করতে। তারপর সেই গুণ্ডাদলের জনা-তিনেক ধরা পড়েছে শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। পুলিস আশা করছে ওদের নিখোঁজ সর্দার আর আরো কয়েকটি দোসরকে শিগগীরই হাতকড়া পরাতে পারবে।

···তবু সাবধানে চলা-ফেরা করা উচিত। খুনের রাজনীতির পুরো মৌসুম চলেছে এখনো। এরই ফাঁক দিয়ে অনেক ব্যক্তিগত

বকেয়া বিরোধেরও রক্তাক্ত ফয়সলা হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্মূল্যের দশকে সব থেকে শস্তা সামগ্রী মানুষের জীবন।

কিন্তু এটা মনে থাকে না সব সময়। কিছুটা স্বভাব আর অভ্যাসের দরুন, কিছুটা বা স্বভাবের দায়ে। সুমনার উদ্বেগ লক্ষ্য করলে মনে পড়ে অবশ্য। কিন্তু ভালও লাগে। তখন আবার আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে সাধ যায়।

উচিত। এই করে সুমনার ভয়ও কমে এসেছে কিছুটা। তবু মাঝে মাঝে থানায় খবর নেয় গুণ্ডারা সকলে ধরা পড়ল কিনা।

...কিন্তু এই সহজ মেলামেশার মধ্যেও হঠাৎ-হঠাৎ কেমন মনে হয় এই মেয়েকে ঠিক-ঠিক জানতে বুঝতে চিনতে এখনো কিছু বাকি। কেন মনে হয় বলতে পারব না।

...এক-এক সময় মুখের দিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। অথচ চেয়ে যে আছে খেয়াল নেই। খেয়াল হলে সচকিত হয়। জিজ্ঞাসা করলে হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসে। নেহাত বিপাকে পড়লে ঠাট্টা করে। অত রূপ, দু'চোখ ভরে দেখব না!

কিন্তু সত্যিই কি দেখে? আগে যে-সব পুরুষের সংশ্রবে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার তফাতটা বুঝে নিতে চায়? বাইরের সঙ্গে ভিতরের রূপ মেলে কিনা তাই দেখে নিতে চায়?

হয়তো তাই। হয়তো বা আরো কিছু। মোট কথা, ওর ভিতরের জগতের যেটুকু আমার কাছে অস্পষ্ট সেটুকু নিয়েই প্রচ্ছন্ন কৌতূহল আমারও। নিজের নিভৃতের জগৎটাই কি দেখা হয়েছে, চেনা হয়েছে?

প্রথম প্রথম কাজল বোসের টাকা রোজগার করা দেখে আমার যেমন অবাক লাগত, সুমনারও ঠিক সেই অবস্থা। প্রায়-অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার যেন সব ওর কাছে। বুদ্ধিও যে ধরে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা কাজ একবার বুঝিয়ে দিলে দু'বার বলতে হয় না।

···কাজল বোস আমাকে মেয়েদের দিকে এগিয়ে দিত। আমি ওকে ছেলেদের দিকে এগিয়ে দিলে ফলপ্রাপ্তি মন্দ হবে না বলেই ধারণা। শুধু ও সঙ্গে থাকার দরুনই কত সময় একটু বাড়তি কদর বাড়তি নজর লাভ করা গেছে। একটা সুশ্রী মেয়ে দেখলে পুরুষমাত্রেই একটু বেশি উদার হয় সম্ভবত। এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করলেও সুমনা হাসে।

কিন্তু এই মেয়েরই অদ্ভুত একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করতে লাগলাম। কোন কাজে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালে সোৎসাহে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ছোটে। কিন্তু কোন মহিলার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ আচরণ দেখলেই মুখভাব বদলে গেল। মুখে কথা নেই, ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে থাকে চুপচাপ। এ ব্যাপারটা সব থেকে বেশি লক্ষ্য করেছি দেবী খান্না বা মিসেস কোরেশি অথবা চন্দনাদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলে। ঠাণ্ডা দুটো চোখ নিজের অগোচরে তীক্ষ্ণও হয়ে ওঠে লক্ষ্য করেছি।

···ঈর্ষাই যদি হয়ে থাকে, আমার কাজের দিক থেকে রমণীর এই ঈর্ষা রমণীয় নয় খুব। কিন্তু কেন যেন নিছক ভাবতে ইচ্ছে করে না। এ নিয়েও খোলাখুলি একদিন কথা বলেছিলাম ওর সঙ্গে। স্বীকার করে না। কিন্তু একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভও তেমন গোপন থাকে না।

মাত্র দেড় মাসের মাথায় এই নিয়েই অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেল একটা। চন্দনাদি বড় দরের একটা চ্যারিটি ফাংশনের পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছে। উদ্দেশ্য মহৎ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন জোর কদমে বেড়ে চলেছে। এখানেও দস্তুরমত বাংলাদেশ বাংলাদেশ সাড়া পড়ে গেছে একটা। বুদ্ধিমতী চন্দনাদি এ সময়ে নিষ্কর্মা বসে থাকার পাত্রী নয়। আমাকে আর সুমনাকে নিয়ে সর্বদিকের নামী আর্টিস্টদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের আনুকুল্য লাভের স্বীকৃতি আদায় করেছে। ফাংশনের দিন স্থির। একদিন নয়, দু'দিনের অনুষ্ঠান।

এখন বাকি শুধু চড়াদামের টিকিট গছানো। এক একদিনে পঁচিশ টাকার নীচে কোন টিকিট নেই—ওপরের দিকে একশ' দেড়শ'। এ কাজে তার প্রধান সহায় আমি।

আমার আপত্তির কারণ নেই একটুও। দু'দিনের সমস্ত টিকিট আমার দখলে। একটি টিকিটও পড়ে থাকবে না এ বিশ্বাস আছে। সুমনা সঙ্গে থাকার দরুন বিশ্বাসের এই জোরটা এবারে আরো বেশি। এসব অনুষ্ঠানের লভ্যাংশে কোনরকম ট্যাক্স বসানোর রীতি নেই—শিল্পীরাও থাবা বসাবে না সে কড়ার আগেই হয়ে আছে—অতএব যা আসবে থোক আসবে। তার এক-তৃতীয়াংশ আমার প্রাপ্য। আনুষ্ঠানিক খরচা বাদ দিয়ে আর চন্দনাদির মজুরী পুষিয়ে বাকি দুই-তৃতীয়াংশের কতটা চ্যারিটি ফাণ্ডে যাবে তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাইনে।

ডোনেশান আদায় বা টিকিট বিক্রির কাজে সুমনা আশাতীত কৃতিত্ব দেখাচ্ছে বটে। আমার সাহায্য ছাড়াই ও অনেক টিকিট বিক্রী করেছে। অতএব চন্দনাদি ভয়ানক খুশি ওর ওপর। আর ভিতরে ভিতরে হয়তো তেমনি রাগ আমার ওপর। আমার সামনেই সেদিন সুমনাকে বলেছিল, তোমার এই 'বস্'টি এক নম্বরের চশমখোর —বসে বসেই তিন ভাগের একভাগ মেরে দিচ্ছে।

এই কাজের উপলক্ষ্যেই চন্দনাদির সঙ্গে ওর যোগাযোগ বেড়ে চলল। টিকিট বিক্রী ছাড়াও আরো কত দিকে মাথা ঘামানোর ব্যাপার আছে। নিখরচায় দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার লোক পেলে চন্দনাদি নিতান্ত আপনার জনের মতই কাছে টেনে নিয়ে থাকে।

…সেদিন অন্য কাজে বেরিয়েছিলাম আমি। সুমনার চন্দনাদির ওখানে যাবার কথা। মহিলা থাকে দক্ষিণ কলকাতার প্রায় শেষ মাথায়। তাই ওর সঙ্গে আজ দেখা হবে না-ই ধরে নিয়েছিলাম। রাত আটটা নাগাদ ঘরে ফিরে দেখি সুমনা বসে আছে—অস্বাভাবিক কঠিন মূর্তি।

—চন্দনাদির ওখানে যাওনি ?

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, গেছলাম।

চাউনিটাও অস্বাভাবিক লাগছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল ?

—কিছু না। এ কাজ আর আমার ভাল লাগছে না।

বললাম, এ কাজ তো আর তিন চারটে দিন গেলেই শেষ।

তেমনি রুক্ষ কঠিন জবাব এলো, শুধু চন্দনাদির কাজ নয়, আপনার কাজও আর ভাল লাগছে না।

আমি হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। বললাম, ভাল না লাগলে করবে না।

—আমি তো করব না. কিন্তু আপনি কি করবেন ? ওই সব -

শেষের উক্তিটা যেন জোর করে গিলে ফেলে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। রাগে বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় অস্বাভাবিক ধক ধক করছে দুই চোখ।

ওর সামনে এসে বসলাম।—কি ব্যাপার বলো তো ?

—বললে আপনি সত্যি জবাব দেবেন ?

মেয়েটা বিকারগ্রস্ত কিনা ভেবে পাচ্ছি না।—মিথ্যে কার ভয়ে বলব ?···চন্দনাদি তোমাকে কিছু বলেছে বোধহয় ?

—হ্যাঁ বলেছে। দেবী খান্না আর শীলা কোরেশির কাছ থেকে আপনাকে সাবধানে রাখতে বলেছে, আমাকে শক্ত হাতে লাগাম ধরতে পরামর্শ দিয়েছে, বলেছে এ যদি আবার ছেড়ে তাহলে আমাকেই দুষবে। আগে যা হয়ে গেছে—গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে স্নায়ু তেতে উঠল আমারও। তবু সংযত ব্যঙ্গের সুরেই বললাম, চন্দনাদির নিজের সম্বন্ধেও সাবধান করা উচিত ছিল।

সুমনা ফুঁসে উঠল, সে-ও কেমন আমি জানি—আমি জানতে চাই ওই তিনজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ? চন্দনাদি যা বলেছে তা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমার সঙ্গে আপনাকে তার ওখানে যেতে হবে—এক্ষুনি !

বিকৃতি জিনিসটা ছোঁয়াচে বোধহয়। নইলে আমারই বা

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল কেন? চেয়ারটা ওর বেশ কাছে টেনে বসলাম। বললাম, তার দরকার নেই, যা বুঝে এসেছ সেটুকুই সব না হলেও মিথ্যেও নয়।···কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন— গঙ্গার ধারে ক'জনের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে বেড়িয়েছ আর ক'জনের দিকে তার থেকেও বেশি এগিয়েছ, সে খবর আমি কখনো নিয়েছি?

বড় মোক্ষমভাবে একেবারে বুকের মধ্যিখানে গিয়ে বিঁধল যেন।

—ও···ও! এই তুমি! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ধকধকে চোখের আগুনে আমার মুখটা বুঝি ঝলসে যাবে—এত নীচ! এত হীন!··· গঙ্গার ধারে যারা হাত ধরে বেড়িয়েছে আর যারা তার থেকে বেশি এগোতে চেয়েছে—অন্য মেয়েদের দিকেও তারা তাকায় টের পাওয়া-মাত্র তাদের মুখগুলো কি-ভাবে আমি পায়ে করে থেঁতলে দিয়ে চলে এসেছি সে-খবর রাখো? স্কাউনড্রেল কোথাকারের—

একটা স্ফুলিঙ্গের মতই সবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি চিত্রার্পিতের মত বসে।

···বসেই আছি।

ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম দশটা বাজে রাত্রি। শ্রীপতিও সাহস করে ডাকেনি আমাকে।

···তার পরেও বসে আছি।

একটা দুর্বোধ্য পর্দা যেন চোখের সামনে থেকে সরেও সরছে না।

পরদিন।

আর একটা রাত্রি। ঘড়িতে একই সময় প্রায়, সাড়ে-আটটার কাছাকাছি।

বসে ছিলাম। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কি একটা অবসাদ ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ উৎকর্ণ আমি। সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। সিঁড়ি-ভাঙার এই সুস্থির ভঙ্গিটা চেনা।

…হ্যাঁ সুমনাই। এক হাতে ছোট সবুজ ফাইল একটা আর এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল একটু। স্থির গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ। ভিতরের সমস্ত শক্তি সংহত করে একটা শোকের ব্যাপার সামলে উঠতে চাইলে যেমন দেখায়।

ঘরে পা ফেলে একটু এগিয়ে এলো।—কিছু টাকা আর চন্দনাদির কিছু কাগজপত্র আমার কাছে ছিল…আর টিকিট-বইগুলো…বুঝিয়ে দিতে এলাম।

উঠে দাঁড়ালাম। জামাটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে বললাম, চলো—

ছু'মিনিট আগেও এ-রকম সঙ্কল্প মাথায় ছিল না। সুমনার দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক। মুহূর্তের জন্য কি ওই কালো চোখের গভীরে আশার আলো দেখলাম একটু? ও কি ভেবেছে ওর সংশয় মিথ্যে প্রতিপন্ন হলেও হতে পারে?

কিন্তু কেন যে ওকে নিয়ে চন্দনাদির ওখানে যাওয়া স্থির করলাম নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। ভিতরে ভিতরে তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিঁড়ে দিয়ে আসার ঝোঁক একটা। কিন্তু তাতে কি ফয়সলা হবে? তাছাড়া এমন একটা ছেলেমানুষি কাজ শীতল ঘোষের করার কথা নয়। অথচ ভিতরটা এই গোছের কিছু করে বসার মতই তপ্ত।

বললাম, তার ব্যাপার তাকেই বুঝিয়ে দিও, এস।

সুমনা আপত্তি করল না। পিছনে নেমে এলো।

দক্ষিণের রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা দূরে এসে হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেলাম আমরা। রাস্তায় একটাও আলো জ্বলছে না, দোকান-পাট বন্ধ, নির্জন থমথমে ভাব। কিছু ঘটে থাকবে। শহর কলকাতার নৈমিত্তিক ব্যাপার, গাড়িটা জোরে চালিয়ে দিলাম শুধু— ভিতরটা তেতেই আছে, কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নয়।

চন্দনাদির বাড়ি এসে শুনলাম, সে নেই। কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে কেউ বলতে পারল না। আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা

করছি। মাঝে মাঝে সুমনার ঠাণ্ডা মুখের দিকে চোখ পড়ছে।···কাল যে দুর্বোধ্য পর্দাটা চোখের সামনে দুলছিল আজ সেটা সরে গেছে। ওর মনের জগৎটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর, আশ্চর্য, ওই দেখার আলোটা যেন নিজের নিভৃতেও এসে পড়ছে।

···রাত সাড়ে-দশটা। সুমনা ওঠার জন্য নিঃশব্দে ছটফট করছে মনে হল। চন্দনাদির সঙ্গে দেখা আজ আর হল না।

—চলো।

আবার সেই নির্জন আঁধারী রাস্তায় গাড়িটা এসে পড়ার দু'তিন মিনিটের মধ্যে বিপদের একটা সংকেত যেন আচমকা মগজের ওপর ঘা বসিয়ে দিল। গাড়ি স্পীডে চলছিল, হেডলাইটে দেখলাম কোথা থেকে তিনটে লোক মস্ত একটা ঠেলাগাড়ি এগিয়ে দিয়ে রাস্তা আটকে দিল। অভ্যাসের বশেই সজোরে ব্রেক কষলাম।

পরমুহূর্তে শরীরের রক্ত হিম।

···দুদিক থেকে দুটো লোক ছোরা হাতে দুদিকের দরজার ওপর দখল নিল, আমার দিকের লোকটার পিছনে অন্ধকারে আর একজন খোলা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে।

নির্মম কঠিন তিন মৃত্যুদূত।

চোখের পলকে দরজা খুলে ফেলে এক হাতে ছোরা উঁচিয়ে অন্য হাতে জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে আমাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাতে চেষ্টা করল লোকটা।—এস চাঁদ, আর লজ্জা কি, অনেক দিনের অনেক পিত্যেশের পর আজ ফাঁদে পা দিয়েছ—আমাদের তিন-তিনটে লোক তোমার জন্যে শ্রীঘরে গেছে—এত দিনে আমার রক্তের তেষ্টা ঘুচবে। এই সাদিক—মেয়েটাকে এদিকে টেনে নিয়ে আয়—নাগরের রক্ত-চান দেখে চক্ষু সাথক করুক—

···হ্যাঁ, অন্তিম মুহূর্তেও লোকটাকে দেখেছি মনে হল! সুমনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল—সেই লোকটা। টানের চোটে জামাটা ছিঁড়ে যেতে চুলের মুঠি ধরে আমাকে টেনে নামাতে চাইছে। ওর

পিছনের লোকটা এবারে পিছনের দরজা দিয়ে পিস্তলের নলটা আমার পিঠে ঠেকিয়ে খোঁচা দিতে এই লোকটা হুকুম করল, খবদ্দার, গুলী করবি না—পরিষ্কার গাড়িটাও চাই আমার, ওই চিড়িয়া নিয়ে পালাতে হবে না এখান থেকে ? দুশো টাকা হাতে পেয়েছি, সাত দিন ওকে নিয়ে ফুর্তি করে আবার বাড়িতে এনে ছেড়ে দিলেই ফের করকরে পাঁচশো টাকা—কেয়া মজাদার দুনিয়া—শালাকে টেনে নামা আগে—

লোকটার মুখ দিয়ে ভক ভক মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। একজনের হাতে পিস্তল না থাকলেও চেষ্টা করা যেত। নেমে এসেছি। শরীরের রক্ত সির সির করে পা বেয়ে নামছে। ওদিকের লোকটা ততক্ষণে একরকম জাপটে ধরেই সুমনাকে টেনে এদিকে নিয়ে এসেছে। শেষ বারের মতই তাকালাম ওর দিকে। অন্ধকারে ভালো মুখ দেখা গেল না—নিস্পন্দ কাঠ হয়ে গেছে।

চোখ বন্ধ করলাম, মাথার ওপর ছোরাটা ঝলসে উঠেছে।

—উঃ !

না, আমার আর্তনাদ নয়। যে লোকটা ছোরা উঠিয়েছে তার। ঠক্ করে জোরে একটা আঘাতের শব্দ পেয়ে চোখ খুলেছি। লোকটা আচমকা আঘাত পেয়ে আমাকে ছেড়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার হাতে লোকটার চাপা হিস হিস কণ্ঠস্বর, খবরদার শ্যামাপদ, এর গায়ে আচড় কাটবি তো এক গুলীতে তোরই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আমি। হায় রে কপাল, এ কার প্রাণ নিতে এসেছিলাম আজ—

…গলার স্বরটা চেনা-চেনা, শ্যামাপদ নামটাও। অন্ধকার ফুঁড়ে ঘুরে পিছনের লোকটার দিকে তাকালাম, তারপরেই বিমূঢ় বিস্ময়ে তাজ্জব একেবারে।

…একদিনের সেই পকেটমার চঞ্চল চাটুজ্যে।

অঘটনে মানুষ মরে, আবার বাঁচেও কত আশ্চর্য ভাবে!

...মনে পড়েছে তক্ষুনি, শ্যামাপদ সেই লোক, দেশের কাজে অর্থাৎ বোমা বানানোর কাজের জন্য যে ওর কাছ থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছল। সেই সঙ্গে কোন এক 'বজ্জাত'কেও।

অন্ধকারে আহত নেকড়ের মূর্তি শ্যামাপদর। ঝাঁপিয়ে পড়ে চঞ্চল চাটুজ্যেকেই ফালা ফালা করে দিতে চাইছে, হাতের ভয়াল জিনিসটার দরুন পারছে না।—বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, এই জন্যে তোর হাতে পিস্তল দিয়েছিলাম!

চঞ্চল চাটুজ্যে পাল্টা জবাব দিল, এমনি দিয়েছিলি—নেশা করলে নিশানা ঠিক থাকে না বলে দিয়েছিলি—বেশি না তড়পে পালা এখন, নইলে দেব ঝাঁঝরা করে।

ক্রুর খেদের এক বীভৎস মূর্তি শ্যামাপদব। নেশা চটে গেছে। বিড়-বিড় করে শুধু বলল, আচ্ছা, দেখে নেব—

অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে চঞ্চল চাটুজ্যে বলে উঠল, যা-যা শালা, সব করবি তুই।

সুমনাকে ধবে তৃতীয় লোকটা বোবা দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে ফিরে চঞ্চল চাটুজ্যে হুমকি ছাড়ল, এই শালা, ছাড় বলছি—আজ থেকে আমি তোদের লীডার।

সুমনাকে ছেড়ে এই লোকটাও পড়ি-মড়ি করে ছুটে পালাল।

চঞ্চল চাটুজ্যে আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল।—কি সার, চিনতে পারছেন?

মাথা নাড়লাম শুধু। মনে মনে বললাম, সেদিনই চিনতে পারিনি, আজ পারছি।

ওর মুখে তিক্ত হাসি। —সব ভগবানের খেলা, বুঝলেন, অত করে কাজ চাইলাম, কাজ দিলেন না, মরীয়া হয়ে শেষে ওই শ্যামা শালার সঙ্গে দেশের কাজে লেগে গেলাম···ও-ই ডাকল আমাকে,

শালার তখন ঝাড়া হাত-পা, টুনিকে ততদিনে টাকা নিয়ে আর এক-জনের কাছে চালান করে দিয়েছে···সাক্ষাৎ শয়তান, আমার লাশ মাটিতে ফেলার জন্যে ঠিক ওৎ পেতে থাকবে···শেষ করে দিলেই হত। যাক, মরি তো একদিনই মরব।

ঘাড় ফিরিয়ে স্নমনাকে ভাল করে এক দফা দেখে নিল। তারপর চাপা শাসনের স্নুরে আমাকে বলল, খারাপ দিনে এত রাতে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন কেন? উঠুন শিগগীর, সামনের গলি দিয়ে পার করে দিচ্ছি, নইলে এখুনি হয়তো আবার—

হন্তদন্ত হয়ে নিজেই গাড়ির সামনে থেকে ঠেলাটা সরিয়ে দিল।

কতগুলো গলির ভিতর দিয়ে আমাদের নিরাপদে বড়রাস্তায় এনে ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। —আচ্ছা সার, গুড্ নাইট, কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর একটা পুজো দিয়ে দেবেন—

বলতে বলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চঞ্চল চাটুজ্যেকে আর দেখতে পেলাম না।

স্নমনার বাড়ির কাছাকাছি এসে আর এক মানুষের মনের জগতের ছবিটা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল হঠাৎ। আশ্চর্য, এ-ছবিরও সবটুকুই চোখের সামনে ছড়ানো ছিল, দেখার চোখ ছুটোই ছিল না শুধু। স্নমনার দিকে তাকালাম, নিস্পন্দের মত বসে আছে। স্নায়ুর ওপর দিয়ে যে ধকলটা গেছে সেটা কাটেনি এখনো। তবু, এই মুহূর্তে যেমন শান্ত তেমনি নির্মম আমি।

গাড়িটা ঘুরিয়ে সোজা কোন বাড়ির সামনে দাঁড় করালাম লক্ষ্য করার পর স্নমনা অবাক একটু। নেমে ওর দিকের দরজা খুলে ডাকলাম, এস—

যন্ত্রচালিতের মতই নেমে এলো।

···বাইরের দরজা বন্ধ, কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে তখনো।]

কড়া নাড়তে দরজা খুলে আমাদের দেখে মণিদা আকাশ থেকে পড়ল প্রায়। —কি ব্যাপার, এত রাতে তোমরা!

সুমনাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার অঙ্কের মাথা তো খুব ভালো…কিন্তু বিকৃতির অঙ্কের ফল কখনো মেলে ?

—কি বলছ খোলাখুলি বল বাপু।

—বলছি, শ্যামাপদকে দেওয়া তোমার ছ'শো টাকা জলে গেল, অবশ্য পরের দেওয়া পাঁচশো টাকা বেঁচেছে কারণ প্রাণ বাঁচাতে শ্যামাপদর নিজেরই প্রাণান্ত অবস্থা—

মণিদার ঢলঢলে মুখে কেউ বুঝি কালি লেপে দিল একপ্রস্থ। তা সত্ত্বেও পুরুষোচিত রোষের অভিব্যক্তি একটু। —তার মানে ?

--মানেটা তোমার থেকে আর কে বেশি জানে। …সুমনা সব খোয়াবার পর ওর চোখে সব থেকে উদারতম মানুষ হয়ে তুমি ওর হাত ধরার অঙ্ক কষেছিলে…আর এত টাকা-পয়সা জমাবার ঝোঁকটাও বোধহয় ওই সুখ-স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে—কি বল ?

—গেট্ আউট্! বেরিয়ে যাও বলছি তুমি আমার বাড়ি থেকে।

চেঁচিয়ে উঠল বটে, কিন্তু থর-থর করে কাঁপছেও।

আমার হাসিই পাচ্ছে। বললাম, দেখ মণিদা, আর কেউ হলে তোমার দাঁত ক'টা একটা একটা করে উপড়ে ফেলত। আমি তা করব না…আমি বলব টাকার মায়া আর তো থাকার কথা নয়, কিছু খরচ করে ডাক্তার দেখাও, ভাল ডাক্তারের ঠিকানা চাও তো আমি দিতে পারি। এস সুমনা—

কিন্তু সুমনার নিজের আসার শক্তি নেই যেন। হাত ধরে ওকে গাড়িতে এনে বসালাম।

ছ'মিনিটের মধ্যেই ওর বাড়ি।

গাড়ি থামিয়ে, বললাম, নামো।

নিজের অগোচরে খানিকটা ঘুরে বসে সুমনা বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার মধ্যে যেন নতুন করে আবার কিছু দেখার আছে।

—অনেক রাত হয়েছে, আর দেরি করো না।

ঈষৎ সচকিত এবারে। দরজা খুলে আস্তে নামল। কিন্তু নেমেও দাঁড়িয়েই রইল।

দরজাটা বন্ধ করার জন্য ওই দিকে এগিয়ে এলাম। বন্ধ করলাম। সুমনা নিষ্পলক চেয়েই আছে।

বললাম, আজ দুটো লোক দেখলে, সমাজের একটা কুৎসিত আবর্জনারও ভিতরের সবটুকু অসুন্দর নয়, আর এতকালের চেনা সুন্দর সুরসিকেরও ভিতরের একটা দিক কত বিকৃত, বীভৎস।... ঘরে যাও, মুখে-হাতে বেশ করে জল দিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করো, খুব ধকল গেছে।...কিন্তু ঘুম যদি না-ই আসে তখন ভাবতে চেষ্টা করো।...চন্দনাদির কাছ থেকে আমার যেটুকু পরিচয় পেয়েছ, যদি মনে হয় সেটুকুই সব নয়, তার বাইরেও আরো কিছু সত্য থাকতে পারে, তাহলে আবার এস।

পথের নির্জন আবছা অন্ধকার সাঁতরে ঘরের দিকে মন ছুটেছে আমার। তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িটাও ছুটেছে। কতকালের কত যুগের একটা জমাট-বাঁধা বাষ্পীয় পাহাড় যেন ভিতর থেকে গলে গলে খসে খসে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। অননুভূত একটা নিশ্চিন্ত আবেশ ঘুমের মত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

...সুমনা আবার আসবে আমি জানি। আসবেই। আমাদের দুজনার সত্তা একই ভাবে আহত, একই রকম তৃষিত। অগোচরের এই মিলটুকুই আমাদের পরস্পরকে কাছে টেনেছে। সেটা আমার গোচরে এসেছে, ওরও এলো বলে। তখন ছুটে আসবে।

...মা-হারা তিন বছরের আবেগপ্রবণ শিশু এগারো বছরে বাপকে হারিয়ে অনাদরের এক গণ্ডীবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে নিঃশব্দে হাহাকার করেছে। আবেগের দিক থেকে তখন থেকেই সে নিরাশ্রয়। ...আর ষোল বছর বয়সে আবেগের দিক থেকে ঠিক তেমনই নিরাশ্রয় সুমনা দাশগুপ্ত। তার বাপের জীবনে আর এক রমণীর নগ্ন অস্তিত্ব ওর সব

বিশ্বাসের স্বপ্ন আর নির্ভরতার স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। সেই থেকে পুরুষকে ও সন্দিগ্ধ চোখে দেখে, কিন্তু তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের রূপ খোঁজে" নিরাপদ আশ্রয় আর নির্ভরতার ভিত খোঁজে। এতকাল সেটা মেলেনি বলেই ওর এত ক্ষোভ এত অসহিষ্ণুতা, পুরুষের দরজায় দরজায় এত ছোটাছুটি।

···সেটা মিলেছে কিনা ওর মনই ওকে বলে দিচ্ছে। আরো দেবে।

এই মুহূর্তে রাতের এই নির্জন পথ পাড়ি দিতে দিতে যে অনু-ভূতিটা এই নিভৃত সত্তার কানায় কানায় ভরাট হয়ে উঠেছে, তার স্বাদ বড় বিচিত্র। এই অতিবাস্তব দুনিয়ার বহু জটিলতার সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়ে এক পেশাদার দালাল এই আমিও যুগের নাড়ির স্পন্দনটুকু কান পেতে শুনছি যেন। সেটুকু যদি কথার আখরে ঘোষণা করে যেতে চাই তো কি বলব?

···বলব, যুগের এই দশক ব্যর্থতায় হাহাকার করছে, কুটিলতায় কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, বিষবাষ্পে গজরাচ্ছে, হিংসার আগুনে দাউ দাউ জ্বলছে আর কলঙ্কিত রক্তবন্যায় ভাসছে। কিন্তু তারও তলায় তলায় প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাটুকু একেবারে মরে যায়নি।

সে তপস্যারত। সে বেঁচে আছে।